দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

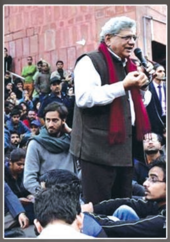

সংগঠিত অনৈতিক
'অসহিষ্ণুতা'
আন্দোলন
ও ক্ষুব্ধ দেশবাসী
.... পৃঃ ১১

মধেশি মোকাবিলায়
চীনা ড্রাগন :
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির
দিকে এগোচ্ছে নেপাল
.... পৃঃ ২৯

৬৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ২ মে ২০১৬।। ১৯ বৈশাখ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

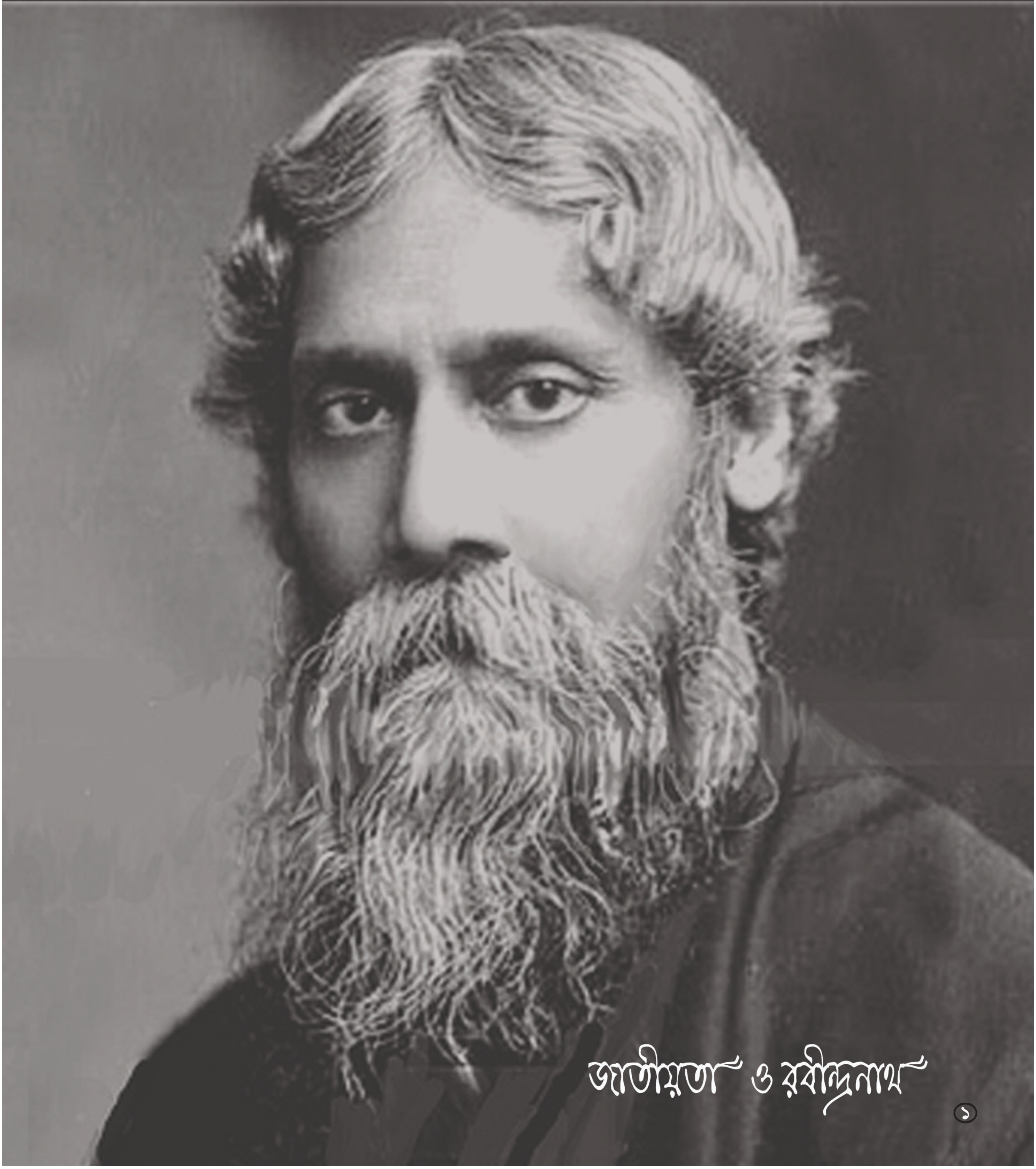

জাতীয়তা ও রবীন্দ্রনাথ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১৯ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২ মে - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,
Website : www.eswastika.com

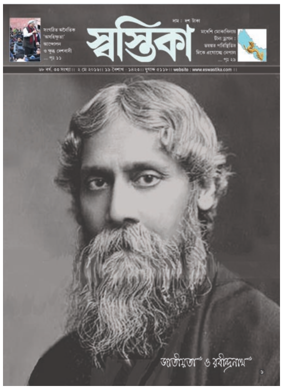

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : মোদীর ঘাড়ে কারাট, এও তো এক ছাপ্পা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

বাম আমলের কুখ্যাত গুন্ডা-তোলাবাজরাই এখন তৃণমূল আশ্রিত দামাল-সন্তান ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সংগঠিত অনৈতিক ‘অসহিষ্ণুতা’ আন্দোলন ও ক্ষুব্ধ দেশবাসী ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১১

বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ▯ ১৪

মুক্ত দৃষ্টিতে শিল্প সমাজের আলো-কালো ▯ পর্ণা মুখার্জী ▯ ১৭

দেশাত্মবোধের সংজ্ঞা ▯ ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার ▯ ২০

নারী জাগরণে পথিকৃৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ▯ ২১

আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক গণপতি চক্রবর্তী ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সঠিক বলে বেছে নেওয়ার মতো কেউ নেই, অনিশ্চিত পরিবর্তন ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

মধেশি মোকাবিলায় চীনা ড্রাগন ! ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে নেপাল ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৯

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের হাল-হকিকত ▯ হলায়ুধমূলি বাক্‌ড়া ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ মে, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মদ্যপান নিবারণ : নীতি নাকি রাজনীতি?

সম্প্রতি বিহারে নীতীশ সরকার মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে। বিষয়টা এদেশে নতুন নয়। মদ্যপানের বিরুদ্ধে উনিশ শতকে ভারতে একাধিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে কোনটা কাজ করছে— নীতি না রাজনীতি? সেই উত্তর সন্ধানই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। আলোচনায় দিব্যজ্যোতি চৌধুরী। সঙ্গে অতীত কথনে অরূপ নাগচৌধুরী।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে...'। দণ্ডিতের জন্য না হইলেও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশী মানুষদের জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতির অশ্রুমোচন এক নজিরবিহীন ঘটনা। লক্ষ লক্ষ মামলার বোঝার ভারে এই দেশের বিচারপতিদের কী প্রচণ্ড চাপের মুখে কাজ করিতে হয়, তাহা বলিতে গিয়া বারবার রুমাল দিয়া চোখের জল মুছিতে হইল ভারতের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরকে। দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চ আদালতগুলির প্রধান বিচারপতিদের যৌথ সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি আবেগাপ্লুত হইয়াছেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে বিলম্বিত মামলার সমস্যার জন্য শুধু বিচারবিভাগের উপর দোষারোপ করা চলিবে না। সুখের কথা, প্রধানমন্ত্রী শুধু বিচারপতিদের কম সংখ্যার সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দেন নাই, সংবিধানগত কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকিলে প্রবীণমন্ত্রী ও উচ্চতম আদালতের বিচারপতিরা আলোচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারেন বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বরং আরও ভালো হয়, বিচারবিভাগ ও সরকারের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব আলোচনা শুরু করা যায়। বিচারবিভাগের সমস্ত স্তরে যথেষ্ট সংখ্যায় বিচারপতিদের নিযুক্ত না হওয়ার কারণও একটি সমস্যা। এই সমস্যা লইয়া পূর্বে কয়েকবার চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই।

দেশের সমস্ত আদালতে প্রায় ৩৮ লক্ষ মামলা পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯৮৭-তে আইন কমিশন প্রতি দশ লক্ষ মানুষের জন্য বিচারপতির সংখ্যা ১০ হইতে বাড়াইয়া ৫০ করিবার কথা বলিয়াছিল। এই জন্য বিচারকের সংখ্যা ৪০ হাজারে লইয়া যাওয়ার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু গত তিন দশকে দেশের জনসংখ্যা ২৫ কোটি বাড়িলেও বিচারপতিদের সংখ্যা ২১ হাজার—প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ১৫ জন। ইহার ফলে নিম্ন আদালতগুলিতে প্রায় তিন কোটি এবং উচ্চ আদালতগুলিতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মামলা পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অর্থ—দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে।

বিলম্বিত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শুধু বিচারপতিদের কম সংখ্যা নহে। কারণ আরও আছে। পুরানো আইন এবং খোদ সরকারেরই নাগরিকদের মামলা করিতে উৎসাহ দেওয়াও ইহার অন্যতম কারণ। যথাসময়ে দেশের মানুষ ন্যায়বিচার লাভ করিবেন, ইহা যেমন বিচারবিভাগের দায়িত্ব, তেমনই সরকারেরও দায়িত্ব। ইহা এমন এক সমস্যা যেখানে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও তৎপরতা দেখাইতে হইবে। বাস্তব হইল দেশের মানুষ সহজে যাহাতে ন্যায়বিচার লাভ করিতে পারে সেইজন্য শাসন, বিচার ও আইন—এই তিন বিভাগেরই সক্রিয় হওয়া আবশ্যক।

প্রধান বিচারপতি এই সম্মেলনে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াও বলা যায়, এমন কিছু বিষয় আছে যাহা আদালতই সমাধান করিতে পারে। বিচারপতিদের নিযুক্তি সম্বন্ধীয় আইন যদি রদ না করা হইত তবে সম্ভবত আজ উচ্চতম আদালতে বিচারপতিদের নিযুক্তির কাজ আরও আগাইয়া যাইত। সংবিধানের মূল কাঠামোর বিপরীত বলিয়া এই আইনটিকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা না করিলেই ভালো হইত। দেশের মানুষকে ইহা জানানো প্রয়োজন যে মূল ধাঁচা বলিতে কী বোঝায় এবং বিচারপতিরাই বিচারপতিদের নিযুক্ত করিবেন—ইহা আদর্শ নীতি কিনা। আরও একটি প্রশ্ন, যখন মামলার বোঝা দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিতেছে, তখন উচ্চতম ন্যায়ালয় ও উচ্চ ন্যায়ালয়গুলিতে এত ছুটির দিন কেন? শুধু তাহাই নহে, উচ্চ আদালতগুলি প্রায় সব বিষয়ই বিচারের জন্য নিজেদের হাতে লইতেছেন কেন? এতসবের পরও বলিতে হয়, প্রধান বিচারপতির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। স্মরণ রাখিতে হইবে—'জাস্টিস ডিলেড বাট নট ডিনায়েড!'

সুভাষিতম্

অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।
মহর্ষি বেদব্যাসের আঠারোটি পুরাণের মধ্যে দুটি মূল কথা হলো—পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ।

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

সমাজে সমরসতার ভাব জাগরণ অত্যন্ত আবশ্যক : ড. কৃষ্ণগোপাল

শ্রীমতীশুভাঙ্গী ভড়ভড়ের হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। পাশে ড. কৃষ্ণগোপাল।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘‘আমাদের দেশে জাতপাত, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভাব কখনও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের সমাজে তা এসেছে! হিন্দু সমাজকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। ডাঃ হেডগেওয়ার এই সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ভারতমাতা কী জয়’ মন্ত্র প্রদান করে আমাদের সকলকে একই মা’র পুত্র হিসেবে পরিচিতি দিয়েছেন। সমাজে এই সমরসতার ভাব নির্মাণ আজ অত্যন্ত আবশ্যক।’’ গত ২৪ এপ্রিল কলকাতায় কলামন্দির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলে ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন আর এস এসের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল।

তিনি আরও বলেন, এদেশকে এখন ‘সঙ্ঘ মুক্ত’ করার কথা বলা হচ্ছে। এর আগে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও বলেছিলেন যে, তিনি ভাগোয়া ঝাণ্ডাকে এক ইঞ্চি জমিও দেবেন না। অথচ ঘটনা হলো সারা দেশে আজ ৫৬ হাজার শাখা চলছে। যখন সঙ্ঘের শক্তি ছিল না তখনও বলেছে, এখন শক্তি বেড়েছে, তাও বলছে। জরুরি অবস্থার সময় সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ৮০ হাজার স্বয়ংসেবক জেলে গিয়েছিলেন। রামজন্মভূমি আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামিল হওয়া আমরা দেখেছি। এরা যে সবাই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত এমন নয়। কিন্তু এদের মধ্যে ভাবনা ও স্বাভিমানবোধ আছে। সামান্য ব্যক্তির মধ্যে অসামান্য ভাব নির্মাণকারীর নামই ডাঃ হেডগেওয়ার। তাঁর নাম এখনও কম লোকই জানে। কিন্তু তাঁর কাজ অর্থাৎ সঙ্ঘকে সবাই জানে। আসলে প্রসিদ্ধি ও সাধনা একসঙ্গে চলে না। সাধনা বা দৈবী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি হলেই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি সোচ্চার হয়।’’

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা ডাঃ হেডগেওয়ারের স্মরণে প্রতি বছর ‘প্রজ্ঞা সম্মান’ দিয়ে থাকে। এবছর এই সম্মানে ভূষিত হলেন নাগপুরের প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী শুভাঙ্গী মুকুন্দ ভড়ভড়ে। তাঁকে শ্রীফল, শাল, এক লক্ষ টাকার চেক ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এটি কুমারসভা প্রদত্ত ২৭তম সম্মান। ডাঃ হেডগেওয়ারের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই সম্মান দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাক্তন আই এ এস এবং সাংসদ অর্জুনরাম মেঘওয়াল। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন যুগল কিশোর জৈথলিয়া, অরুণ মল্লাবত, মোহন পারীখ, মহাবীর প্রসাদ বাজাজ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। ধন্যবাদ জানান লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা।

অভিযোগ বিজেপি-র

হিন্দু সন্ত্রাসবাদের গল্পের পেছনে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হিন্দু-সন্ত্রাসবাদ আসলে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি। গত ২২ এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসকে এভাবেই বিঁধলেন বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। ২৬/১১ কাণ্ডে অভিযুক্ত লস্কর জঙ্গি মার্কিন নাগরিক ডেভিড হেডলির সাক্ষ্য, মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে মুখ্য অভিযুক্তের বয়ান বদল এবং ইশরাত জাহান কাণ্ডে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হলফনামা বদলের ওপর ভিত্তি করে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি. চিদাম্বরম ইশরাত জাহান কাণ্ডে হলফনামা বদলের কথা স্বীকার করে এর দায় চাপাতে চেয়েছেন স্বরাষ্ট্র-সচিব ও অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর। ঘটনা হলো যে ২০০৯ সালের ২৯ জুলাই চিদাম্বরমের সই করা হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে ইশরাত আর তার তিন সহযোগী যারা ২০০৪ সালে আমেদাবাদের শহরতলিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এনকাউন্টারে প্রাণ হারায়, তারা ছিল লস্কর-এ-তৈবার জঙ্গি। যদিও এর দেড় মাস বাদে কেন্দ্র আরেকটি হলফনামা দাখিল করে আদালতে যেখানে ইশরাতেরা যে লস্কর জঙ্গি ছিল সেটি চেপে যাওয়া হয়। এই হলফনামাতেও স্বাক্ষর করেছিলেন চিদাম্বরম। হেডলির সাম্প্রতিক সাক্ষ্যে ইশরাতেরা যে লস্করের সদস্য ছিল তা সামনে এসেছে। বিজেপির দাবি তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফাঁসানোর জন্যই ইশরাত জাহান কাণ্ডে মিথ্যা এনকাউন্টারের গল্প খাড়া করতে চাইছিল কংগ্রেস। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে জাহান যে লস্কর সদস্য সেটি চেপে যাওয়া হয়।

সুধাংশু ত্রিবেদী স্পষ্টই বলেছেন, এক্ষেত্রে তদন্ত তার নিজস্ব গতিতে তো চলেইনি। বরং পদে পদে তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে। ২০১০ সালে মার্কিন দূতের সঙ্গে রাহুলের কথাবার্তা উইকিলিক্স কেবল-এর সৌজন্যে প্রকাশ্যে এসেছিল যেখানে কংগ্রেস সহ-সভাপতি দেশের সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিসেবে 'গৈরিক চরমপন্থা'কে দায়ী করেছেন। সুতরাং কংগ্রেস পরিকল্পনা মাফিক 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব খাড়া করে মুসলিম

ভোটব্যাঙ্ক লুটের চক্রান্ত করেছিল বলে বিজেপির দাবি। এই দাবির স্বপক্ষে তারা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল শিন্ডে, দিগ্বিজয় সিংয়ের মতো কংগ্রেস-নেতাদের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য তুলে ধরেছেন যেখানে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বিনা প্রমাণে বিভিন্ন হিন্দু-গোষ্ঠীকে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প- বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগেই অভিযোগ করেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী ইশরাত জাহান এনকাউন্টার মিথ্যা মামলায় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার ছক করেছিলেন। ত্রিবেদীর কণ্ঠেও ওইদিন একই অভিযোগ শোনা যায়।

হিন্দু শরণার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর গুচ্ছ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, এনডিএ সরকারের ঠিক দু'বছর পূর্তির প্রাক্কালে তিনি তাঁর কথা রাখলেন। ইসলামি মৌলবাদীদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এদেশে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু ও শিখদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মোদী সরকার। হিন্দু, শিখ শরণার্থীরা যে-কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে, স্থাবর সম্পত্তি কিনতে, প্যানকার্ড, আধারকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স করাতে পারবেন। রেশন কার্ড পাবেন। বিদেশি পঞ্জীয়ন কার্যালয়ে হাজিরা বাধ্যতামূলক নয়। চাকরি না পেয়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি বাধ্যতামূলক নয়, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই সকল শরণার্থীদের ভারতের যে-কোনো প্রান্তে যাতায়াতের অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এছাড়াও নাগরিকত্ব গ্রহণের ব্যাপারে এক বড় বদল ঘটতে চলেছে। বর্তমানে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তা ১০০ টাকা হতে চলেছে। প্রসঙ্গত বর্তমানে এরা দীর্ঘমেয়াদি ভিসা নিয়ে ভারতে থাকেন এবং সব মিলিয়ে হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা দু' লক্ষের বেশি।

বোমা বানানোর সহজ উপায় শেখানো হচ্ছে অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'বোম বানানে কা আসান তরিকা' অর্থাৎ বোমা তৈরির সহজ উপায় শীর্ষক একটি তথ্য সম্প্রতি নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির চোখে পড়েছে। ওয়েবসাইট Justpaste.it-তে দেশলাই কাঠির মতো গৃহস্থালীর কাজে লাগে এমন জিনিসপত্তরের সাহায্যে কীভাবে বোমা তৈরি করা যায় তা বলা হয়েছে। ইসলামি স্টেট (আই এস)-এর সন্দেহজনক ভারতীয় এজেন্টদের কাছে বোমা তৈরির কৌশলটা জানানোই এর লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় বারো পৃষ্ঠার এই তথ্য নির্দেশিকা কয়েকজন সন্দেহভাজন এজেন্টের কাছে 'কিক'-এর মতো নির্দিষ্ট মাধ্যমের সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। এন আই এ-র মতো তদন্ত সংস্থাগুলি সারাদেশে আই এস-এর সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ ব্যাঙ্গালুরু চার্চস্ট্রিটে এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত করতে গিয়ে এন আই এ প্রাক্তন সিমি কর্মী আলমজেব আফ্রিদিকে গত জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার করে। জেরার মুখে সে স্বীকার করে এই তথ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করেই বোমা তৈরি করে। একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাকে এই বোমা তৈরির কৌশল জানিয়ে দেয়। 'কিক'-এর মাধ্যমেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

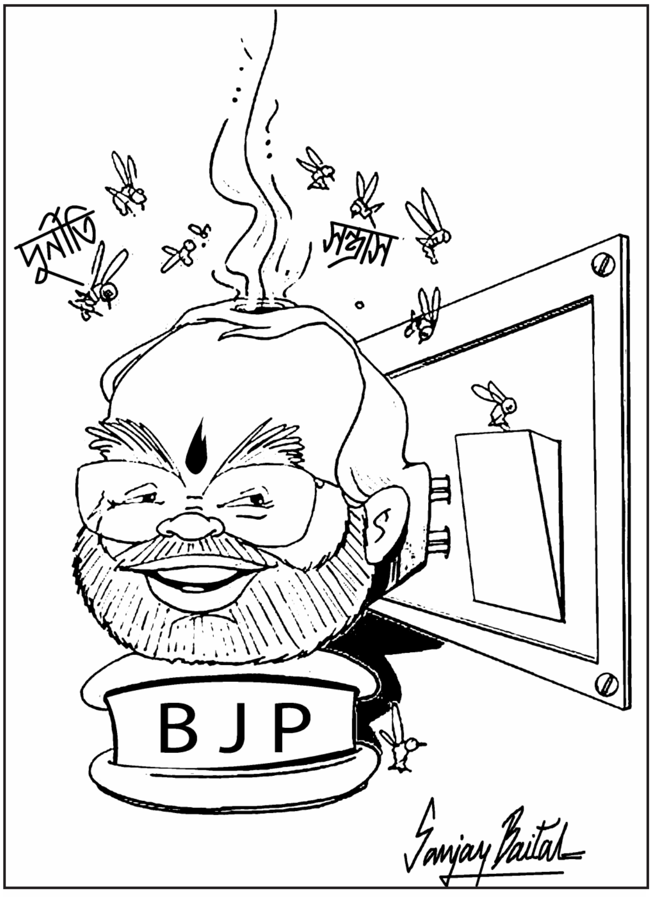

উবাচ

"কাহারও কোনো অসীম (absolutism) ক্ষমতা থাকতে পারে না। রাষ্ট্রপতি ভুল করতে পারেন।"

কেএম জোসেফ

উত্তরাখণ্ড বিধানসভা স্থগিত রাখা বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।

ভি কে বিস্ট
উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

"প্রতিরক্ষা, মানবিকতা, বিপর্যয় মোকাবিলা, মহাকাশ সহযোগিতা, সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন প্রয়াসের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য আমাদের বিশ্বাস—এটা হলো কংগ্রেসের জন্য একটি আদর্শ সুযোগ যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা সরাসরি শুনতে পারি।"

ইউ এস স্পিকার পল রাইন-কে লেখা চারজন আইন প্রণেতার চিঠি। আগামী ৭-৮ জুনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে।

"আমেরিকা আর ইরান, যারা পরস্পরের ঘোষিত শত্রু, তারা যদি হাত মেলাতে পারে, তবে এই অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তানের হাতে হাত না মেলানোর কোনো কারণ দেখছি না।"

মেহবুবা মুফতি
মুখ্যমন্ত্রী,
জম্মু-কাশ্মীর

মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম জনসভায় ভারত-পাক সম্পর্ক প্রসঙ্গে

"মামলার পাহাড় জমে যাচ্ছে দেশের আদালতগুলোয়। আর রোজই সেই পাহাড়ের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা পেরে উঠছি না। সত্যি সত্যিই আর পেরে উঠছি না।"

টি এস ঠাকুর,
ভারতের প্রধান বিচারপতি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের যৌথ সম্মেলনে।

মোদীর ঘাড়ে কারাট, এও তো এক ছাপ্পা

মাননীয়
উত্তম কুমার, তৃণমূল সাংসদ
তৃণমূল ভবন, কলকাতা

ডেরেকবাবু, আপনি নিশ্চয়ই এই সম্বোধনে রাগ করেননি। আসলে আপনিই তো তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তম কুমার। মানে আপনিই তো মুখ। মানে মুখপাত্র। সব থেকে কইয়ে বলিয়ে। সব থেকে চালাক। আপনি টুইট করে কথা বলেন।

আমি বাংলা মিডিয়ামের ছেলে তো! তাই উত্তম কুমার পর্যন্তই দৌড়। না হলে, কোনো হলিউড স্টারের সঙ্গে তুলনা করতাম। আপনি যেমন ইংরেজি বলেন তাতে আপনাকে হলিউডেই মানায়। আপনি কুইজ মাস্টার। সেই ছোটবেলা থেকে আমি আপনার ফ্যান। আপনার মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কত জানেন আপনি!

আপনি এত সুন্দর সুপারইম্পোজ করতে পারেন সত্যিই জানতাম না। জানলে আরও আগে থেকে আরও ভক্তি বাড়ত।

কিন্তু শেষে যেটা হলো সেটা সত্যিই মানা যায় না। দিদির কাছে আপনার অনেক কিছু শেখা বাকি। দিদি কী সুন্দর নারদ টিভির ঘুষ ফুটেজ দেখেই বলে দিয়েছিলেন সেটা জাল। আর আপনি ১২ ঘণ্টা সময় নিলেন জাল ছবি বোঝার জন্য। তাও আবার বিজেপি আসল- নকল বুঝিয়ে দেওয়ার পরে। কম্পিউটারে যে প্রযুক্তির সাহায্যে কারচুপিটি করা হয়েছিল, প্রযুক্তিবিদ্যার ভাষায় তাকে 'সুপারইম্পোজ' বলে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, একটি বিষয়ের উপর আরেকটি বিষয় চাপিয়ে দেওয়া। যার ফলে মূল বিষয়টির চরিত্রের বদল ঘটে। নরেন্দ্র মোদীর মুখে প্রকাশ কারাটের ছবি বসিয়ে আপনি ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। ছবিটির চরিত্র বদলে দিয়েছে মূল ছবিটি অপরিবর্তিত রেখেই। বস্তুত কেবল একটি ছবির ক্ষেত্রেই নয়, সার্বিকভাবে রাজ্য-রাজনীতিতে 'সুপারইম্পোজিশনে'র খেলা চলছে। সে জন্যই নির্বাচনে ভূতুড়ে ভোটারের হদিস মিলেছে। এই ভূতেরা আসলে শাসকদলের লোক। অন্যের ভোট দিয়ে দিতে তারা সিদ্ধহস্ত। অর্থাৎ, স্বাধীন নাগরিকের চরিত্রে নিজেকে 'ইম্পোজ' করে গণতন্ত্রের উৎসব মুখরিত হচ্ছে। নির্বাচনের পর গণতন্ত্র আন্দাজ করছে— উদোর ভোট বুধো দিয়ে দিয়েছে। যাকে সাদা বাংলায় বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। কারাটের মাথা মোদীর ঘাড়ে। রামের ভোট রহিমের হাতে। দুটোই তো ছাপ্পা নাকি? আপনি ক্যুইজ মাস্টার। আপনিই এই প্রশ্নের উত্তর ভালো দিতে পারবেন। সবই জাল। ছবিও জাল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ওই ছবি সত্যি ছিল। আসল ছিল। ভুল স্বীকার করার আগে পর্যন্ত।

সারদা-কাণ্ড, নারদ-কাণ্ডকে 'অপপ্রচার', 'জাল' বলছেন দিদি। কিন্তু এখন যখন সভায় সভায় গিয়ে বলছেন, আগে জানলে ভাবতাম, পরিবারে কিছু দুষ্টু ছেলে থাকে তখন আর ঘুষ-ফুটেজ জাল থাকে না। আসল হয়ে যায়। ভোটাররা অবশ্য আগেই বুঝেছে তৃণমূলের দাবিগুলোই জাল। সত্যকে চাপা দিতে বাস্তব চিত্রটিকে 'সুপারইম্পোজ' করা হচ্ছে। মাঠে-ঘাটে-বক্তৃতায় সেই কাজটিই নিপুণ দক্ষতায় ঘটিয়ে চলেছেন আপনার নেত্রী। দিদিরে আলাদা করে 'শিল্পীশ্রী' শিরোপা পাওয়া উচিত।

লেনিন বলেছিলেন, রাজনৈতিক যুদ্ধে কখনও কখনও এক পা এগিয়ে দু'পা পিছোতেও হয়। নারদ-কাণ্ড জনসমক্ষে আসামাত্র যদি তিনি পদক্ষেপ করতেন, তাহলে লেনিনের 'স্ট্র্যাটেজি' মিলে যেত। কিন্তু ঘটনার এতদিন পরে, এত কথা হয়ে যাওয়ার পর যখন তিনি পদক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন, তখন কালে কালে বেলা গড়িয়েছে অনেক।

নারদ-কাণ্ড সত্য কি না, তা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যদিও আমজনতা সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তাই তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। উড়িয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত অভিযোগ। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছিলেন। 'অফেন্স' দিয়েই 'ডিফেন্স' রক্ষার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বুঝতে পারেননি, সব সময় তত্ত্বটি খাটে না। সব সময় সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাওয়া যায় না। প্রাথমিকভাবে যাকে এগনো বলে মনে হয়, তা নেহাতই আপেক্ষিক। সময় প্রমাণ করল, আসলে ট্রেডমিলে হাঁটা হয়েছিল। এগনো তো যায়ইনি, বরং খানিক পিছোতে হয়েছে।

আপনি উত্তম কুমার। ভুল স্বীকার করেছেন। ক্ষমা চাননি। ডেরেক সাহেব, প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে বিকৃত করা কিন্তু বড় অপরাধ। সাইবার ক্রাইম। সাবধানে থাকবেন।

— সুন্দর মৌলিক

বাম আমলের কুখ্যাত গুণ্ডা তোলাবাজরাই এখন তৃণমূল আশ্রিত দামাল-সন্তান

গূঢ় পুরুষের কলম

রাজ্যের পঞ্চম দফার ভোট শেষ। এই প্রতিবেদন যখন ছাপা হবে তখন ষষ্ঠ দফার ভোটও সম্ভবত শেষ হয়েছে। বাকি থাকবে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। তৃণমূল কংগ্রেস যে সমাজবিরোধীদের দল সে কথাটা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। খবরের কাগজ এবং টিভি চ্যানেলের সৌজন্যে কলকাতার ভোটের বাজারে হিরো হয়ে উঠে এসেছে শাসকদলের গ্যাং লিডাররা। তারা এখন রীতিমত সেলিব্রেটি। যেমন, দমদমের দীপক বিশ্বাস আর পকাই। লেকটাউনের পিনাকী ও হাতকাটা দিলীপ। নিউ আলিপুরের ভোম্বল, ল্যাংড়া হুলো। বেহালার পায়রা বাপি। বন্দর এলাকার সুভান, আনোয়ার। ভবানীপুরে মমতার চোখের মণি ভিকি ও রবি। এরা সকলেই তাদের এলাকার দাগি তোলাবাজ। পুলিশ এদের খাতির করে। কারণ, শাসকদলের উপরতলার স্নেহময় হাত তাদের মাথায় আছে। ল্যাংড়া হুলো, পায়রা বাপিরা এখন শাসকদলের দামাল সন্তান। দলের নেত্রীর ভাষায় আমার দলের তরতাজা ছেলেরা পিকনিক করার জন্য সামান্য কিছু টাকা চাঁদা চাইলে তোলাবাজ তোলাবাজ বলে চিৎকার শুরু হয়ে যায়। বাম আমলে যখন চিকনা রাজু, শাহজাদারা চাঁদা তুলে পিকনিক করতো তখনতো সাংবাদিকরা তাদের তোলাবাজ বলে চিহ্নিত করেনি।

নেত্রী জানেন যে বাম আমলের কুখ্যাত গুণ্ডা তোলাবাজরাই এখন তাঁর দলের আশ্রিত তরতাজা দামাল সন্তান। বাম আমলে টালিগঞ্জ এলাকার ত্রাস শেখ বিনোদ রাজ্যের পরিবর্তনের জমানায় তৃণমূলের নেতা। নির্বাচন কমিশনের কড়া হুকুমে পুলিশ শেখ বিনোদকে গারদে পুরেছে। এতে তৃণমূল নেতৃত্ব বিপন্ন বোধ করছে। এবার শেখ বিনোদ এবং তার দলবলের উপর দায়িত্ব ছিল প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ ও রাসবিহারী এলাকায় ছাপ্পা ভোট করানোর। দায়িত্ব পেয়েই শেখ বিনোদ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। এই দাগি অপরাধী যে ভোট লুটের নকশা তৈরি করছে সেই খবর পেয়ে নির্বাচন কমিশন দলবল-সহ শেখ বিনোদকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয় পুলিশকে। গত ২১ এপ্রিল কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখা তাকে গারদে পুরে দেয়। পুরভোট-সহ গত কয়েকটি নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের যে দাদাদের দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল এবার তারা অনেকেই কাটাবে গারদের পিছনে। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া গুণ্ডাদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় ৩০ এপ্রিল ভোটের আগে দাবি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা না হলে স্বয়ং পুলিশ কমিশনারকেই শাস্তি পেতে হবে। কোনো অজুহাত চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ পর্ব এখন প্রায় শেষের দিকে। দুরন্ত গরমের মধ্যে মানুষ যেভাবে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন তার প্রশংসা করতেই হবে। আর শাসকদলের কাছে এটাই ভয়ের কারণ। বীরভূমে ভোট লুঠেরাদের দৌরাত্ম্যের প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার পরেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কঠোরতম ব্যবস্থা নিয়েছে। আইএএস আইপিএস অফিসার থেকে থানার ওসি পর্যন্ত রদ বদল করে দলদাস আমলাদের প্রাণে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। অতীতে কোনো নির্বাচনে এত ব্যাপকভাবে আমলাদের বদলি করা হয়নি এই রাজ্যে। এতে একটা বার্তা গেছে প্রশাসনের সর্বস্তরে। শাসকের দলদাস হয়ে কাজ করলে সার্ভিস রেকর্ডের বারোটা বেজে যাবে সরকারি ভোটকর্মীরা বুঝে গেছেন। শাসকের পোষা মাস্তান গুণ্ডাদের ভোট লুঠের ছকও বহুক্ষেত্রেই বানচাল হয়েছে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে। ভোটের ফলাফল কী হবে জানিনা। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি যে সারদা আর নারদ হুলে কলঙ্কিত তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা মোটেই স্বস্তিতে নেই। ১৯ মে ভোটের ফল ঘোষণা হবে। জনরোষে শাসক তৃণমূলদল ক্ষমতা হারালে অবাক হবেন না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সততার প্রতীক নন সেকথা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। নারদ হুলের ফুটেজ যে জাল নয় সেকথাও নেত্রী জানেন। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে দলের সাংসদ বিধায়করা যে বিস্তর টাকা কামিয়েছেন সে কথাও দলনেত্রী জানেন। তাই বলছেন যে তাঁর দলের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার এতটাই বিত্তশালী যে নারদের ওই সামান্য টাকা তাঁর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। ইচ্ছে করলে কাকলি পঞ্চাশটা নারদ কিনে নিতে পারেন। কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা। তাই নেত্রী বলছেন, ঘটনা সত্য না মিথ্যা তদন্ত করতে হবে। আবার বলছেন, সংসারে একজন-দুজন খারাপ হতে পারে। তাই বলে গোটা সংসারটাই খারাপ নয়। নেত্রী বলছেন পুরোটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র। নারদ ঘুষকাণ্ড লোকসভায় এথিক্স কমিটির কাছে পাঠিয়ে বিজেপি চাইছে তৃণমূলের পাঁচজন সাংসদকে বহিষ্কার করতে। নেত্রী বুঝে গেছেন যে তাঁর সততার মুখোশ ছিন্নভিন্ন। জনরোষ বাড়ছে। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ইতিমধ্যে নারদ স্টিং পরিচালক সাংবাদিক কলকাতায় এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল বলেছেন, 'অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা কী জানতেন আমি কে? আমি আই এস আইয়ের চর কিনা? কেবল টাকা নেওয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক।'

উত্তর সম্পাদকীয়

সংগঠিত অনৈতিক ‘অসহিষ্ণুতা’ আন্দোলন ও ক্ষুব্ধ দেশবাসী

দেবীপ্রসাদ রায়

দিল্লী জেএনইউ-তে দেশবিরোধী স্লোগান ও পোস্টারে সারা দেশ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতাদের বাছাই করে অপরাধী করে তুলে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা কমিউনিস্ট দলের এক কূটকৌশল। দেশের অনেক অংশেই প্রতিভাবান বহু ছাত্রকে বলি দিয়ে রাজনীতির মূলধন করা হয়েছে। বিগত শতকের ৬০-এর দশকে উগ্রবামপন্থী কমরেডদের দিয়ে নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে দেশের সঙ্কটমূলক পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করেছে কমিউনিস্টরা। মাঝখান থেকে স্কুল-কলেজে গণটোকাটুকি, খুন জখমের বিপ্লব করে হারিয়ে গেল বহু প্রতিভাবান ছাত্র। নেতারা বিদেশে পালিয়ে গিয়ে পুঁজিবাদী আমেরিকার প্রসাদে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। পরে শাসন ক্ষমতায় এসে অনেক নকশালকেই ঘরে ফিরিয়ে নেয় সিপিআই(এম)। কীভাবে? অসীম চ্যাটার্জীকে মনে করুন। ছাত্রনেতা কৃষ্ণকানহাইয়াকেও ওইভাবে তৈরি করে নেওয়া হলো রাজনৈতিক কাজে লাগাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের চলতি নির্বাচনে তাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অনুমোদন নিয়ে দেশবিরোধী সমাবেশ হঠাৎ করে ঘটেনি। পাকা পরিকল্পনা মাফিকই তা হয়েছে। তাড়াতাড়ি দৃশ্যমান হতেই এই প্রয়াস এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে নিয়েও কটাক্ষ করা! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যদি এটা করা কোনো ছাত্র গোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা হয়, দেশদ্রোহী কাজের বিরোধিতা করাও একই অধিকার। সৃষ্ট গণ্ডগোল তো এই কারণেই। প্রশ্ন হলো

জে এন ইউ-তে ছাত্রদের সমর্থনে সীতারাম ইয়েচুরি। বসে রয়েছেন (একেবারে বাঁ দিকে) রাহুল গান্ধী।

শিক্ষায়তনে এটা হবে কেন? ‘আফজলগুরু এবং ইয়াকুব মেনন’ তো ছাত্রসমস্যা সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়— তা নিয়ে শিক্ষায়তন কলুষিত হবে কেন? পশ্চিমবঙ্গেও আমরা জানি শিক্ষায়তনগুলির হাল —কারা দায়ী, কেন দায়ী আমরা সবাই জানি। তবু তথাকথিত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রগতিশীলতার মুখোশ পরা ব্যক্তিদের, এই দুষ্কর্মকে আড়াল করার প্রয়াস কেন? ছাত্রঘেরাও দ্বারা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ সাধনা সরকারের হত্যা, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ অমিয় কিস্কুর লাঞ্ছনা ও ছাত্র সুদেব ঘটকের নৃশংস হত্যা কলেজ প্রাঙ্গণে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের ওপর কুৎসিততম লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ এসব তো চোখের সামনেই ঘটেছে। উপাচার্য সুগত মারজিতের লাঞ্ছনা এর নবতম সংযোজন--- সম্প্রসারিত এই অপসংস্কৃতির। তবুও নাড়া খায়নি বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ কিছু মানুষের বিবেক, তাই এই ধৃতরাষ্ট্রবৎ আচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, হোস্টেলে কি না ঘটেছে— ব্রা পরে আন্দোলন। চুমু খাওয়ার আন্দোলন। ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি-বিরোধী সমস্ত আচরণের পরীক্ষাভূমি হয়েছে যাদবপুর— আচার্য অপমানের অভাবিত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়েছে। কোনোদিন দেখা যাবে নগ্ন বা নগ্নিকা হয়ে ঘেরাও আন্দোলনও শুরু হবে, প্রশ্রয়িত হবে! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দোলের দিন যা দৃশ্য দেখেছে মানুষ তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। উদ্বেগজনক ভবিষ্যতের জন্য!

যাদবপুর! —এই সব বিজ্ঞ প্রাজ্ঞরা কোন হিসেব নিকেশে পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছেন ও যোগাচ্ছেন বিহ্বল দেশবাসী তা বুঝতে পারছে না। এই হট্টগোলের পর হঠাৎই একটি প্রবন্ধ দেখা গেল। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ, যাদবপুর থেকে আলোচনা— নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার চলে গেল— তাদের ঘোষণা ও প্রাপ্তির মূল্যায়নে। অর্থাৎ থলি থেকে বিড়াল প্রকাশ্যে এল।

কেন দাদরির ঘটনা হল? কলবার্গি হত্যা হল? নরেন্দ্র দাভোলকর হত্যা হল? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দায়ী— বিজেপি দায়ী, আর এস এস দায়ী! রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় রাজ্য সরকারের। ঘটনাগুলি ঘটেছে, সব

কটি অবিজেপি শাসিত রাজ্যে। আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া রাজ্য সরকারের দায়। নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা হলো কেন? কুসংস্কার দূরীভূত না হওয়ার কারণে এতবড় বিশাল দেশে বনবাসী গ্রামে 'ডাইনি' পোড়ানো হয় দলবদ্ধ ভাবে, বধূ হত্যা হয় পণের জন্য— অনবরতই হয়ে চলেছে— দুঃখজনক কিন্তু অতীতেও বহু ঘটেছে। তার জন্য হঠাৎ নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য বস্তু করা কেন? কেন খেতাব ত্যাগের হিড়িক? প্রতিযোগিতায় নেহরু ভাগ্নী নয়নতারা সায়গল ১৯৮৬-তে পাওয়া খেতাব ২০১৫-তে ফিরিয়ে দিলেন কেন? ১৯৮৪-তে কংগ্রেস পরিচালিত শিখদাঙ্গার প্রেক্ষিতে খেতাব নিয়েছিলেন কী করে? কোথায় বিবেক বন্ধক দিয়েছিলেন? নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলেই বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে উপরাষ্ট্রপতি অভিযোগ করে বসলেন মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য হচ্ছে— আমির খান, শাহরুখ খান তারা ভীত জীবনযাপন করছেন— যার জন্য আইএস ভারতকে আক্রমণের টারগেট করে ফেলল। দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন— কেন? যুগযুগান্ত ধরে সহিষ্ণুতা দেখানোর পর এই অসহিষ্ণুতার কলঙ্কলেপন প্রয়াস দেশবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে পারে। ভোটের জন্য মুসলমান বান্ধব হতে মরিয়া কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা আর এস এস-বিজেপির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ প্রথমাবধি। বিজেপি-আর এস এস উত্থান কেন হলো? কারণ সংখ্যাগুরু হিন্দুরাই প্রচণ্ডভাবে অসাম্যের শিকার, সংখ্যালঘু তোষণের শিকার— কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের উৎখাত নিয়ে কেউ ভাবে না বিজেপি-আর এস এস ছাড়া; বাংলাদেশে নিরন্তর হিন্দু নিধন, মন্দির ধ্বংস, সম্পত্তি গ্রাস নিয়ে কেউ সরব হয় না বিজেপি আর এস এস ছাড়া। কোন দেশ আছে যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানও এত মর্যাদা পায়, সংখ্যাগুরু এত সংখ্যালঘু আতঙ্কে ভোগে? ১৯৮৩ সালে এক মাইনোরিটি ডেলিগেটকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন— "Minorty cannot claim to be secured by constraint initating the minority." শুধুমাত্র ভোটের জন্য সংখ্যালঘুদের সুবিধাদানে সংখ্যাগুরুর ওপর মাত্রাধিক চাপ একদিন বিপর্যয় ডেকে আনবে— বলেছিলেন আনসার হোসেন খান (Rediscovery of India, Orient Longmans)।

ইনি ১৯৮৭ সাল অবধি রাষ্ট্রসঙ্ঘে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৭-তে অবসর নিয়ে পাকিস্তান কর্তৃক দেশে তাঁর জন্য আকর্ষণীয় পদ তৈরি ছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতে আসেন, তারপরই ওই বইটি লেখেন। রামমন্দির নিয়ে যুক্তিসঙ্গত কারণে হিন্দুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আসতে ইনি বুখারি, এম. জি. আকবরের কাছে আবেদন রেখেছিলেন। ভারতে তথাকথিত সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষ্যে যা প্রচারিত হয় তার স্বরূপ দেখে তিনি লিখেছেন ওই বইতে—এর চাইতে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলে মুসলমানরা অনেক নিশ্চিন্ত ও সুরক্ষিত জীবন পেত। আর এস এস, সাভারকরের মূল্যায়ন বহুজন করেছেন বহু আগেই। ওয়ার্ধায় আর এস এস ক্যাম্প দেখতে গিয়ে মুগ্ধ ও প্রভাবিত গান্ধীজী লোকসেবক সঙ্ঘ (এম এস এস) প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন, কংগ্রেস দলটাই ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন (গান্ধী ইচ্ছাপত্র)। নেহরু অবিমৃশ্যকারিতার মূল্য হিসেবে বিপুল সংখ্যক আহত জওয়ানদের চিকিৎসায় যখন সমস্যা হয়েছিল আর এস এস-এর স্বয়ংসেবকরা প্রাণপণে জওয়ানদের সেবা করেছিল। মুগ্ধ নেহরু প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে আর এস এস-কে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আজকের প্রগতিশীল কমিউনিস্টরা তখন চীনের পক্ষ নিয়ে নিরুত্তর— সেই ট্র্যাডিশনেই ভারতবিরোধী প্রয়াসে তার সহমর্মিতা ও সমর্থন চলছে আজও। ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময়েও আর এস এস দিল্লীর নাগরিক প্রশাসন সাবলীল রাখতে সহযোগিতা করেছিল প্রাণপণ, তখন বাংলায় দেশদ্রোহীরা স্লোগান দিচ্ছিল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। নকশালরা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক আচরণ করে, যাতে নিজেদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করে বা যারা তাদের শংসাপত্রের জন্য লালায়িত থাকে তাদের দেশবাসী এতদিনে চিনতে, বুঝতে শুরু করেছে। দাদরি ঘটনায় বিজেপি-আর এস এস কতটা সংযুক্ত তা উত্তরপ্রদেশ সরকার তদন্ত কমিশন বসালেই পারে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির ধারক ও বাহকরা সে দাবি তুলে আন্দোলন করতেই পারে, তা করছে না কেন? হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রোহিতের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল আর এস এস বলে যাঁরা মনে করেন তারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের আগে প্রচারে সিদ্ধান্ত নেন কী করে। তদন্তই তো বলে দেবে কী ঘটেছিল— কেন ঘটেছিল— রোহিত আত্মহত্যা করেছিল, না আত্মহত্যা ঘটানো হয়েছিল।

ইশরত জাহান রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে হেডলি। নরেন্দ্র মোদী খুন না হওয়ায় অতৃপ্ত অনেকে। বিচার বিভাগ নরেন্দ্র মোদীকে মুক্ত করেছে— আশাহত অনেকে। রাহুল গান্ধী থেকে ইয়েচুরি, অরুন্ধতী রায় থেকে অমর্ত্য সেন— তো কী করা যাবে সত্য চাপা থাকে না যে! গোধরাতে পুড়িয়ে মারা ৫৬ জনের জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ছিল না, ছিল প্রতিক্রিয়া— দাঙ্গায় নিহত মানুষের জন্য, সবার নয় শুধু মুসলমানদের জন্য, দেশ যে সেকুলার! ...অরুন্ধতীর 'আউট লুক'-এ কী লিখেছিলেন যার জন্য পরে ক্ষমা চাইতে হয়! গোধরা ঘটনার একপেশে বাড়াবাড়িতে Eco & political Weakly বামপন্থী পত্রিকাতে শ্রীকান্ত সন্ত্রানী লিখেছেন বিরক্ত হয়ে "Our intellectuals are known for their great facility with words but not precision in their use. They have taken likewise with phrases to establish the depth of their anguish at the happening of Gujrat. One has seen terms such as 'Genocide's and 'holocaust' used by our men and women of letters. These words have come to be associated with specific historic events of infinitely worse magnifade and are not appropriate to in present debates" [Eco & Pol Wekly : Gujrat's burning Train. India's Inferno] নরেন্দ্র মোদীর কার্যকলাপ জনস্বার্থের পরিপন্থী বলে বিরোধীপক্ষ নিশ্চয়ই আন্দোলন করবে, তার ব্যর্থতা তুলে ধরবে সেটা অন্য কথা। কিন্তু

বিদ্বেষবশত অপপ্রচার করে নিজেদের অসহিষ্ণুতা কদর্যভাবে প্রকাশ করে যে মানসিক দৈন্য বিভিন্ন দলের নেতা এবং তাদের সহকর্মীরা দেখিয়েছেন তার জন্য গোটা দেশ লজ্জিত। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আনা এবং তৈরি করা অভিযোগ একে একে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কোর্টে এবং কোর্টের বাইরেও এবং সপ্তরথীর অভিমন্যু বধ ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে শুধু মাত্র ভোটবাজির জন্য নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ আর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সহ্য করবে না। কারণ তারা এখন বুঝতে পারছে,

(১) স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত কাদের চাপে রাষ্ট্রগীতি হিসেবে সংসদে গৃহীত হয়েও অবমাননাকর, অমর্যাদার সম্মুখীন হয়। একটি উদাহরণ —এপিজে আব্দুল কালাম এসেছেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এ। সভার শেষে রাষ্ট্রগীত হিসেবে 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া ঠিক হয়ে গেছে— মহড়া দিয়েছে গায়িকারা, শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করে দেওয়া হয়— বহু উদাহরণের একটিমাত্র।

(২) যাদের খুশি করতে এসব করতে হোত তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সংযুক্তি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ন্যূনতম।

(৩) কাদের চাপে দূরদর্শনের লোগোর নীচে লেখা 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' পাল্টে দিয়ে হয়েছিল 'সত্যম প্রিয়ম সুন্দর'?

(৪) কারা বলে আমরা আগে মুসলিম পরে ভারতীয়, যেখানে আর সবাই জাতীয় সংহতি বোধে এবং প্রকাশ্যে বলে— আমরা আগে ভারতীয় পরে বিশেষ ধর্মাবলম্বী।

(৫) কেন বহু গ্রামে শহরে হাজার হাজার বছর ধরে অনুসৃত সকাল সন্ধ্যায় শাঁখ বাজানো বন্ধ করার হুমকি আসে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে— খোদ কলকাতার ফ্ল্যাটেও?

(৬) এই অন্যায় জুলুমবাজি বন্ধ করতে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনের মতো কে ব্যবস্থা নিতে পারে?

(৭) কেন সারা দেশ জুড়ে কোথাও না কোথাও পূজা মণ্ডপ আক্রমণ— প্রতিমা ভাঙা চলছেই?

(৮) কেন ভিয়েতনামে বা ইরাকে বম্বিং হলে সে দেশের মানুষের জন্য এখানে প্রতিবাদ মিছিল হয়—মানববন্ধন হয়, অথচ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার হলে, কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের দেশ ছাড়তে বাধ্য হলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মৌনীবাবা হয়ে থাকেন? হজরতবাল মসজিদে কেশ চুরি রটনা করে যারা দাঙ্গা চালিয়েছিল তাদের নিন্দা করার দাবি ওঠেনি কেন? কারণ এইসব বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ মুখোশধারীরা তখনো ছিলেন!

(৯) সাভারকরকে এই শ্রেণীর বিজ্ঞপ্রাজ্ঞরা যে দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যায়ন করেছেন অনেক প্রথিতযশা শ্রদ্ধেয় মানুষ। নেতাজী কেন সাভারকরের পরামর্শ চাইতেন এঁরা জানেন কি? এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যার জন্য। তিনিও কি দেশদ্রোহী? এঁরা কিন্তু ইতিহাস লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পাত্তা দেয় না— রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ''বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়ে আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরাদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়তে হয় যে ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেউই নই, আগন্তুক বর্গই সব।'' তখন তাঁর কথা তাদের মনে পড়ে না। তাঁরা মার্কসবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্কুল স্তরের ইতিহাসও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেন। এদের মূল্যায়নে রাজনীতিতে সুভাষ বসু আস্থাযোগ্য লোক ছিলেন না, তাঁকে বিশ্বাস না করে কমিউনিস্টরা ঠিক কাজই করেছেন (মর্ডান ইন্ডিয়া-সুমিত সরকার)... ''বিধান রায় ভারতের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল মুখ্যমন্ত্রী'' (ঐ) কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ICHR সম্পর্কে Asian Age লিখেছিল— 9th Auguest 1998 "The ICHR has over the years transformed into a works into which an increasing number of research work and a spirating sum of fands regularly vanishes." ICHR ঘনিষ্ঠ ইরফান হাবিব প্রমুখের সহায়তা ও সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী ও নেহরু পরিবারকেই তুলে ধরে তৈরি করা Time Capsule মহাত্মা গান্ধীর সমাধির নীচে স্থাপন করেন— সুগত বসু এই ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার ধারারই একজন। নেহরুর উদ্দেশ্যমূলক অনুদান (Nataji Research Bureau)- পুষ্ট হয়ে নেতাজী মৃত্যুতদন্তকে বিভ্রান্ত করে বই লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ধারণামতো এই দুরাদৃষ্টক্রমে চাপানো 'ইতিহাস' থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। কারণ কয়েকটি প্রজন্ম এই মার্কসীয় চক্রান্তে নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্রান্স আমেরিকা এবং পরে আমাদের উপগ্রহ ছবিতে ধৃত সম্ভাব্য সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব নিয়ে BARC (বার্ক) সমেত যে সব গবেষণাসংস্থা কাজ করেছে তাদের কাজ বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়েছেন ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার ইত্যাদি মার্কসীয় ব্রান্ডের ইতিহাসবিদ। এই চক্রান্ত বন্ধ করে গবেষণা চালাতে হবে। অতি সম্প্রতি মার্কসবাদী নেতা সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, বিজেপি-আরএসএস বিশ্ববিদ্যালয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করতে চাইছে। সত্যি কী অন্যায়! উগ্রমার্কসবাদই তো থাকবে!

কলম ধরা অবসর প্রাপ্ত বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ মাথারা কি আর একবার ভাববেন?

পুলিশ বাড়াবাড়ি করে অনেক ক্ষেত্রে— নিরপরাধ ছাত্ররা যেন উৎপীড়িত না হয়— কিন্তু তার আড়ালে দেশদ্রোহিতার বীজ এবং বীজবপনকারীরা যেন আর রেহাই না পায়।

(লেখক প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিদ্যা, ক্রীশ্চান কলেজ, বাঁকুড়া)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

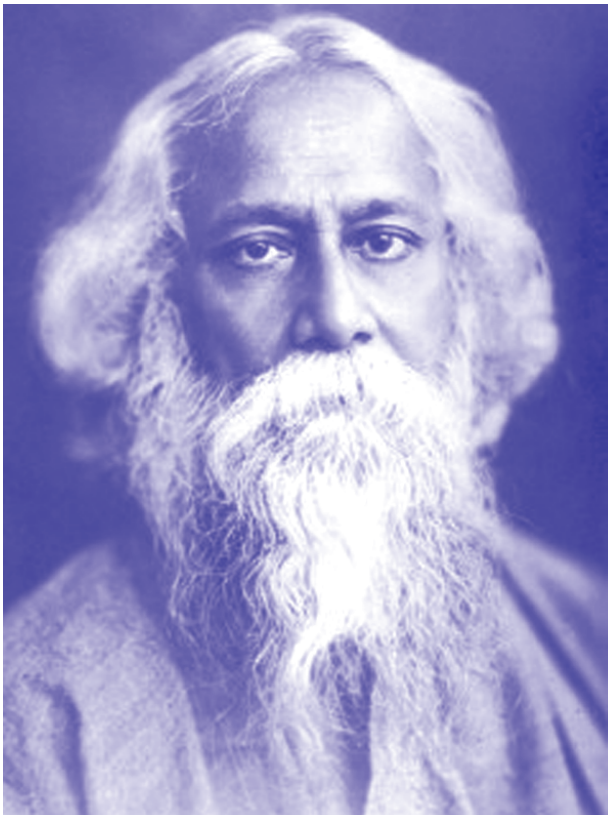

বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

স্বাধীনতার আটষট্টি বছর পরেও আমাদের জাতীয়তা, দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ, সেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিই আবার নতুন করে উঠে আসছে। এই সমস্যার সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ভাবতেন, ২৫ বৈশাখ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তা প্রকাশ করা হলো।

—সঃ স্বঃ

কবি তারপর বললেন, আজ দেশের সর্বত্রই সবচেয়ে প্রবলভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে আজও পর্যন্ত নেতারা কার্যোপযোগী কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারও কারও মনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এমন একটা অস্পষ্ট ভাব রয়েছে, যাতে করে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশি প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। কবির তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি বললেন, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম সম্পর্কীয় আভিজাত্য গর্বিত শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্বল।

মানব-স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে করে কবি বিশ্বাস করেন না যে, অবস্থার দাবি নয়, মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে।

কবি বললেন যে, মোপলা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্বল, এমনি অসহায়ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে।

'আমি বিশ্বাস করতে পারি না', কবি বললেন যে, 'মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার দরুনই তা আর সম্ভবপর হবে না।'

হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব প্রায় করে তুলেছে আর একটি যে প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মোসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে আর এই ধর্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

'আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছি', কবি বললেন যে, 'আফগান বা অপর কোনো মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কি না। জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।

আঙ্গোরায় আজ বিরাট এক মোসলেম-শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিখিল-মোসলেম ভাবকে এই অভ্যুদয় অনেকটা শক্তি জুগিয়েছেন। এর জন্য আমরা হিন্দুরা ততক্ষণই আনন্দ প্রকাশ করতে পারি যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ের সাহচর্যে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়।'

সমস্যার সমাধান

এ সমস্যার হবে না কেবলমাত্র হিন্দুর খেলাফত আন্দোলনের সমর্থনে। অমিলের প্রধান একটা কারণ-পরম্পরা বর্তমান। বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না আর এতদিন পর্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আসছি।

'এই সমস্যা', কবি বললেন, 'মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে, সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে।'

কবি তারপর একটু হেসে বললেন— 'আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তা হলেই সম্ভব হয়, যদি সব হিন্দু মুসলান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোনো ভাবে যা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট। ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু' সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা একসঙ্গে কাজ করিতে পারি। হিন্দু আর মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলি ক্রমশ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদি গড়ে তুলবে যা আর কোনোমতে সম্ভবপর হবে না।

পল্লি-সংগঠন ব্যাপারে এই ভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বললেন— কেবলমাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে ওই আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।

কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চোখে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না? —এ প্রশ্নের জবাবে কবি বললেন--- 'হ্যাঁ, তা হবে বই-কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনও করছে— আমরা তো কখনও বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?'

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বললেন--- তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবি নিজে করেছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?

'কিন্তু'--- কবি তারপর বললেন--- 'হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড়ো কঠিন— যেসব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।'

কবি তারপর বললেন, 'আমি আমার জমিদারিতে দেখেছি হিন্দু প্রজা কোনোরূপ সংস্কার বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে।'

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বললেন যে, মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার আরও কারণ হচ্ছে ওইসব সামাজিক ব্যবস্থা। প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করবার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বললেন আর বললেন দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিত মালব্যজী মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হিন্দুদের শারীরিক শক্তি অর্জন করা আবশ্যক বলেছেন।' আমি তাতে আপত্তি করে বললাম যে, মালব্যজী ঠিক ওকথা বলেননি। তিনি বলেছেন যে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি মানুষ মাত্রেই থাকা উচিত এবং হিন্দুদেরও থাকা উচিত। তবে একথা ঠিক পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে, বিভিন্ন স্থানে, অত্যাচার হিন্দুদের উপরই হয়েছে, এবং হিন্দুরা তারা প্রতিরোধ করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অত্যাচার করেছে, একথাটা মালব্যজীর মনে গ্রথিত থাকা সম্ভব নয়। এবং হিন্দু মহাসভার যে সব উদ্দেশ্যে আবাহন, তার অন্যতম হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও শারীরিক শক্তি ও সাহস অর্জনে তাদের প্রবৃত্ত করা। এই হিসাবে হিন্দু মহাসভার হিন্দুদিগের শারীরিক শক্তি অর্জনের কথা পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য বক্তারা যা বলেছিলেন তাতে কারও কারও মনে এটা উদয় হওয়া বিচিত্র নয় যে হিন্দু-মুসলমান-আন্দোলন মুসলমান বিদ্বেষে দূষিত।

গায়ের জোর

রবিবাবু বললেন যে, গায়ের জোর, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সকলেরই থাকা উচিত এবং তা অর্জন করবার চেষ্টা মানুষ মাত্রেই করা উচিত। শুধু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন, সর্বপ্রকার আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়তে পারার শক্তি মানব মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, শুধু গায়ের বল থাকলে বা তা অর্জনের চেষ্টা করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না, অর্থাৎ অরগানাইজেশন গড়ে ওঠে না।

পাঞ্জাবে বা যুক্তপ্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতুটাতু খায় কিন্তু হিন্দুই পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই অরগানাইজিং স্পিরিট কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্মই তাকে অরগানাইজ করেছে। মুসলমানের ধর্ম সাম্যবাদমূলক। মুসলমান মুসলমানে যে সহানুভূতি তার ফাউন্ডেশন বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্মে। হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ বর্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে বুঝি তা অরগানাইজেশনের পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্তপ্রদেশের এক গল্প বলছিলেন। আফ্রিদিরা প্রায়ই সীমান্তের বৃটিশ প্রজাদের উপর চড়াও করে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে

ছিল। তিনি দেখলেন যে হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হলো না, তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কী রকম। আপনারা যে টুঁ শব্দটি করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, 'উয়োঃ তো বেনিয়াকা লেড়কি।'

কবি বললেন, 'এই তো হিন্দুর মন, মুসলমান কিন্তু কখনও এরকম জবাব দেবে না।'

হিন্দু মহাসভা

কবি বললেন, 'হিন্দু মহাসভা যদি হিন্দু-সমাজের কীটস্বরূপ দৈহিক ও নৈতিক অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারতেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও কাজের মতো এক কাজ হোত। কিন্তু ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এই যে হিন্দু মহাসভা তার কিছু করতে পারলেন না। হিন্দু যেখানেই ছিল সেখানেই থাকল এক পদও অগ্রসর হলো না অথচ মুসলমানদের চটিয়ে দেওয়া হলো। এখন যেখানে এক কুস্তির আখড়া হবে— মুসলমান অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলবে, ওই দেখ হিন্দুরা আমাদের মারবার জন্য গায় জোর কচ্ছে।

হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে গায়ে জোর করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘরে গলদ দূর করতে পারলে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (ফিজিকেল ও মর‍্যাল) দোষ আছে তা নিরাকরণ করতে পারলে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা করলে কিন্তু হবে না, মুসলমান হিন্দুদের দেখে গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতে পারে। এ রকম চেষ্টা ও বিপরীত চেষ্টা কেবল পাপের পথে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল কি?' কবি আবার বললেন, 'শারীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জন করা দরকার সে তো চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দেশ করে তা-ই উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টাই হচ্ছে গোড়ার কথা।'

দেশাত্মবোধ

'দেশাত্মবোধ কীসে জাগে? দেশ একটা abstract কিছু নয়। দেশের শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উপর মমতা থেকেই দেশাত্মবোধ জাগে। মুসলমানের দেশাত্মবোধ নেই সে কথা আগের বারেই বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরও যে বিশেষ আছে তা নয়। দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পল্লিগঠনে মন দিতে হবে। যখন পল্লিতে পল্লিতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় এক বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে,— তখনই জানবে সত্যিকারের দেশাত্মবোধের সূচনা হয়েছে।'

'এই সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষা করাবার জন্য তখন হিন্দু-মুসলমান আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়বে।' কবি বললেন, 'সেদিন যে আমি বলেছিলাম, মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মুসলমানের বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে এবং সে ডাকাত যদি মুসলমান হয়, তাহা হলেও কি সে মুসলমান ডাকাতের বিরুদ্ধে হাত তোলে না বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না? সেই রকম হিন্দু-মুসলমানের গড়া প্রতিষ্ঠান যদি আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণকারী যদি মুসলমানও হয় তা হলে তা রক্ষা করবার জন্য মুসলমান স্বধর্মাবলম্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হবে না। এমনকী পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমানরা এসে যদি ওই সকল প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে, তাহলেও মুসলমান তাকে বাধা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সারা ভারতের পল্লিতে পল্লিতে যখন এইরকম প্রতিষ্ঠান সব গড়ে উঠবে তখন দেখবে সত্যিকার দেশাত্মবোধ জেগেছে। তখন যদি বহিঃশত্রু--- মুসলমান--- এসে ভারত আক্রমণ করে, তাহা হলে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মিলে তার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি অসম্ভব যে, বহিঃশত্রু মুসলমান এদেশের মুসলমানদের বলবে যে এদেশটা জয় করে তোমাদেরই দেওয়া যাবে, হিন্দুদের সঙ্গে কেন শরিকানে দখল করবে? মুসলমানের কাছে তখন কোন্‌টা বড়ো বলে বোধ হবে? ধর্মের টান, না হিন্দু- মুসলমানের ঐক্য?'

কবি বললেন, অবশ্য সেটা যে একেবারে অসম্ভব তা তিনি বলতে পারেন না। 'লোক ক্রোধান্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। ধর্মান্ধ হয়েও নিজের স্বার্থ বলি দিতে পারে। তবে আমি বলি এই যে, এইরকমভাবেই ঐক্য গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখছি নে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওইরকম সঙ্কট কালে মুসলমানের দেশাত্মবোধই জয়লাভ করবে।'

১৯২৩

টীকা : বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

সংক্ষিপ্ত পাঠ। একাধিক বৈঠকে নেওয়া গোটা সাক্ষাৎকারটি ৫, ১৪ ও ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ আনন্দবাজার পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। বিজলী পত্রিকাতেই কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী প্রথম ছাপা হয়েছিল ৬ জানুয়ারি ১৯২২ তারিখে। বিজলী ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঋষি অরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৯২০ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিন পরে পত্রিকাটি আরম্ভ করেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা মৃণালকান্তি বসু শুধু সাংবাদিকতা নয়, কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সদস্য হিসেবে রাজনীতি ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিলেন। পরে অবশ্য কংগ্রেস ছেড়ে দেন। পেশাগত জীবনে অমৃতবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং অল্প সময়ের জন্য সম্পাদক। পরে সম্পাদক হিসেবে ফরওয়ার্ড পত্রিকায় যোগ দেন। উত্তর জীবনে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

এই সাক্ষাৎকারটিই সম্ভবত পরে অনুদিত হয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল ১৯২৪ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদের ফলে এর থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা ছিঁড়ে নিয়ে নানা জনে নানা উদ্দেশ্যে আজও ব্যবহার করেন।

বিজলী পত্রিকার সাক্ষাৎকার এবং রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কবিজীবনী নবম খণ্ডে প্রশান্তকুমার পালের সংগৃহীত তথ্য, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে তিনি বিজলী সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুকে যা বলেছিলেন, পত্রিকায় মুদ্রিত প্রতিবেদনে তাঁর মূল বক্তব্য ঠিক থাকলেও তার গড়ন বদলে যাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্যই তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে লিখে সভায় পাঠ করতে এসেছেন— এই ভূমিকা করে তিনি প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করেন।' ▮

মুক্ত দৃষ্টিতে শিল্প ও সমাজের আলো-কালো

পর্ণা মুখার্জী

দেখার মূল কথা হলো চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি সেই দেখা দেখেই আমরা তৃপ্ত থাকি না। শুধু দেখার বাইরে আমরা অনেক কিছুকে খোঁজার চেষ্টা করি। তাতে হয়তো সবসময় আমরা আনন্দ পাই না। কিন্তু যদি আমরা শুধুই দেখি সেই দেখা আমাদের অনুভূতিকে একধরনের নাড়া দেয় এবং সে দেখা হবে অবশ্যই সংস্কারমুক্ত। কবিগুরুর ছবির মূল অর্থ আমার কাছে হলো আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব। কখনও উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে অনুজ্জ্বলতা আবার কখনও অনুজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বলতা। রবীন্দ্রনাথ ছবিকে দেখেছেন চিরবন্ধনমুক্ত, চিরসংস্কারমুক্ত সৃষ্টি হিসাবে। যেখানে ছবি হয়েছে কোনো তত্ত্ব ছাড়াই, কোনো ব্যাকরণ ছাড়াই। এখানেও আমরা তার চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার কথাই খুঁজে পাই।

এই ছবিতে উপস্থিত আলো-অন্ধকার ছাড়াও সমাজের নানান আলো-অন্ধকারকেও ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন ভালোবাসা-ঘৃণা, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ ইত্যাদি। আসলে এই সমাজকে যদি আমরা একটা প্রেক্ষাপট ভাবি তাহলে সেখানেও নানানধরনের আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি থাকে; এর সম্মিলিত রূপই সৃষ্টি তা সে গানেই হোক, ছবিতে হোক, কবিতাতেই হোক কিংবা জীবনধারণ বা জীবনগঠনেই হোক। এখানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখা ও পরে দেখা দিয়ে ভাবনা। এখানে রবীন্দ্রনাথের শ্যামলীর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হলো সে।"

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কালোতে আলোর উপস্থিতিতেই দেখা এবং আলোর উপস্থিতিতে একটি ফুলকে আমার সহজ সরল দেখা, পরে তা সুন্দর গোলাপে রূপান্তরিত। আমরা একই ভাবে যদি কোনো ছবিকে যা হয়তো শিল্পী সাদার ওপরে কালো দিয়ে এঁকেছেন কিংবা কালোর ওপরে সাদা দিয়ে এঁকেছেন, কিংবা রঙিন রঙে রাঙিয়েছেন; তার সঙ্গে আমাদের এই পার্থিব জিনিসের কোথাও মিল আছে কিনা তা খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করি। তার কারণ আলোকচিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদিতে আমরা এত বেশি সমাজের হুবহু ছাপ দেখি, তার প্রকৃতিকে তো আমরা সবসময় দেখছিই কাজেই তারই মতো কিছুকে পাওয়ার জন্য আমরা ব্যাকুল হই এবং শিল্পে সবসময় তাই অনুকরণ খুঁজে বেড়াই। শুধু চাক্ষুষ করাতেই তৃপ্ত থাকতে পারি না। যে কারণে সাধারণ মানুষ জ্যাকসন পোলকের ছবির সঙ্গে কোনো পার্থিব জিনিসের সাদৃশ্য খুঁজে না পাওয়ায় তাকে অনুভব করতে পারে না। অন্যদিকে সোমনাথ হোড়ের 'উন্ডস্' সিরিজের কাজ দেখলেও ততখানি তৃপ্ত হয় না। যখন জানতে পারে এগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার দেখা কিছু ক্ষতচিহ্ন তখন হয়তো কিছুটা আশ্বস্ত হয়। আমাদের এই অনুকরণবৃত্তি ও সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা শিশুর জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়। যেমন— যখন কোনো শিশু জন্মায় সে বাবার না মা'র কার মতন এই ভাবনায় বিভোর থাকি। শিশুটি শিশুর মতোই এক উজ্জ্বল সৃষ্টি শুধু তা দেখেই আমাদের আশ মেটে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।

বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় ভালবাসাও প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে গেছে। 'I love you'-এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'I need you'। শুধু ভালোবাসাতেই আমরা বোধহয় তৃপ্ত থাকতে পারি না। আমি জানি না এটা সমাজের আলোকিত দিক না অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। এই পোস্ট মর্ডান যুগে ভালোবাসা কি নতুন দিকে মোড় নিল, না অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার মৃত্যু ঘটাল? শুধু দেখার মধ্যে যেমন অনেক চাওয়া-পাওয়া এসে জোট বাঁধে তেমনি এই ভালোবাসার সঙ্গে অনেক চাওয়া-পাওয়া যুক্ত হয়ে যায়। 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্' এই কথাটি যখন আমরা আমাদের দুই চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারব তখনই আমাদের দেখা সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি কোনো পরিপ্রেক্ষিত মেনে ছবি আঁকেননি। সেক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির উন্মাদনাই ছিল প্রবল মূল উপাদান। তাই তাঁর ছবি হয়েছে কোনো ব্যাকরণ না মেনেই। অনুরূপ স্বতঃস্ফূর্ততা আমরা পাই ফোক আর্টের মধ্যে। লোকশিল্পীরা যখন আঁকল, তখন তাদের দেখা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছবিতে রূপান্তরিত হলো। তারা ভালোবাসা থেকে আঁকল। যা তাদের কাছে প্রিয় তাই ছবিতে স্থান পেল। এক্ষেত্রে যখন তারা একদল মেয়ের নাচের দৃশ্য আঁকছে, তখন সামনের সারির মেয়েদের যেমন তারা দেখাল, তেমন পিছনের সারির মেয়েরাও ছবিতে স্থান পেল একইভাবে। এক্ষেত্রে গোল হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নাচের দৃশ্যটাই তাদের বেশি আকৃষ্ট করেছে। যা তারা দেখছে তাই এঁকেছে। এখানে কোনো ব্যাকরণ নেই। এরকম ধরনের সহজ সরলভাবে দেখার ছবি তাদের অনেক পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন সংস্কারমুক্ত সৃষ্টির কথা। তা সে ছবিতেই হোক, কবিতাতেই হোক, গানেই হোক কিংবা তাঁর অন্য কোনো রচনাতেই হোক। সংস্কার সৃষ্টিকে অনেক বেশি কঠিন, অনেক বেশি আবদ্ধ করে দেয়, যার কারণে তিনি ছবির নামকরণ থেকেও বিরত থাকতেন। কারণ আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে নামকরণ ধরে ছবির বিষয়কে খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করি। সেখানে ছবির নিজস্ব গুণাবলীও যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি দর্শকের শিল্পভাবনাও ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন শিল্পকর্ম যদি প্রকৃতই বন্ধনমুক্ত হয় ও সংস্কারমুক্ত হয় তাহলে একদিন রঙ আকারের বেড়াজালে আটকে থাকবে না। আমরা পোস্ট মর্ডান যুগে তার প্রমাণ পাই, বর্তমানে কালারফিল্ড পেন্টিং অবশ্য তার অন্যতম উদাহরণ।

এই সংস্কারমুক্ত সমাজের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গাতেই বলেছেন। তাঁর লেখা 'রবিবার' চিত্রনাট্যটিতেই আমরা তারই ছাপ পাই। অভিক চরিত্রটির মাধ্যমেই তিনি সেকথা বোঝাতে চেয়েছেন। সমাজের কালো দিকের সঙ্গে আমাদের আপোশ করতে হয়েছে বারবার। সংস্কার আমাদের বারবার বধ করেছে। সাদা রঙ ও কালো রঙকে আমরা নানাভাবে বর্ণনা করেছি; শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি। হিন্দুদের বিয়েতে রঙিন পোশাক ব্যবহৃত হলেও বিধবাদের ক্ষেত্রে ধার্য হলো সাদা পোশাক। আবার খৃষ্টানরা এই সাদা

পোশাককে গ্রহণ করেছেন শুভ প্রতীক হিসাবে। তারা বিয়ের সময় সাদা পোশাক ব্যবহার করে আবার মৃত্যুর সময় সবাই সমবেত হয় কালো পোশাকে। এই গেল সামাজিক রীতি নীতি মেনে সাদা কালোর প্রতীকী ব্যবহারের কথা। কিন্তু সাদা পায়রা আবার শান্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কথায় কথায় বলতেন জ্বরের সময় ধবধবে সাদা ঘরে থাকলে অনেক সময় জ্বর সেরে যায়। সাদা রঙ চোখের দেখা দিয়ে আমাদের মনে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থ করে তোলে। আমাদের মনের দৃঢ়তা বাড়ায়।

ছবির মূল কথা যদি সাদা ও কালো হয়; তাহলে জীবনের মূল কথা হলো জন্ম ও মৃত্যু। এখানে জন্মকে যদি আলোর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে মৃত্যু হলো অন্ধকারের প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ''আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠছে ফুটে,'' তখন জন্মকে আলোর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে আবার মৃত্যুকে অন্ধকার বলে চিহ্নিত করেছেন কবি বুদ্ধিদেব বসু। তাঁর কথায়—

''মৃত্যুর নাম অন্ধকার; কিছু মাতৃগর্ভ— তাও অন্ধকার;''

এখানে মৃত্যু যেমন অন্ধকার তেমনি মাতৃগর্ভকেও কবি অন্ধকার বলেছেন। কিন্তু এই মাতৃগর্ভ নতুন প্রাণের আশা বহন করে। সেক্ষেত্রে মাতৃগর্ভ আলোর উৎস। অর্থাৎ ভাষান্তরে অন্ধকার আলোর উৎস। রবীন্দ্রনাথও অন্ধকারকে আলোর উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কথায়—

''অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো।''

সর্বোপরি বলা যায়, আমরা যদি সত্যিই শিল্পকে এক উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারতুম তাহলে শিল্পের এক বড় অংশ আজকে পর্নোগ্রাফি হয়ে দাঁড়াত না। একদিকে যেমন সৃষ্টি সাধনার স্বতঃস্ফূর্ততায় শিল্প রচনা হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে শিল্পীদের এক বড় অংশ বাধ্য হচ্ছে বাজারী শিল্প সৃষ্টিতে। সেক্ষেত্রে চিত্রকলা রূপান্তরিত হচ্ছে ফলিত কলায়। একজন শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তার মুক্ত দৃষ্টিতে শিল্প দেখা বিঘ্নিত হয় বাজারি চাহিদায়। সে তার নিজস্ব সৃষ্টিতে আরোপিত করছে কমার্শিয়াল চিন্তাধারা। স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে সরে এসে শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে। এটা শিল্পকলার এক অন্ধকার দিক। এই অন্ধকার অবশ্য শুধু চিত্রকলায় নয়, কবিতাতে, গানে, সাহিত্যে ইত্যাদিতে একইভাবে ঘনিয়ে আসছে। কোনো লেখক স্বাধীনভাবে লিখতে পারে না, কোনো গায়ক স্বাধীনভাবে গাইতে পারে না, কোনো চিত্রকর স্বাধীনভাবে আঁকতে পারে না। এক্ষেত্রে অবশ্য সামাজিক ব্যবস্থা অনেকটাই দায়ি। জীবনধারণ অনেক কঠিন, তাই হয়তো শিল্পীদের অনেক কিছুর সঙ্গে আপোস করতে হচ্ছে। 'Art for art's sake' আজ অনেকটা আপেক্ষিক। শিল্পকে আজ দেখতে হচ্ছে ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাই হয়তো শিল্পীরা রেনেশাঁর আগের যুগে ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে হয়তো উন্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখা হারিয়ে যাবে, সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে দেখা। তাই কবি আশা করেছেন—

ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে।
স্বপনবাধা টুটি বাহিরে এল ছুটি,
অবাক আঁখি-দুটি হেরিল তারে।।

মনে হয় আমরা চর্মচক্ষু দিয়ে তখনই দেখতে পাব যখন আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাব। এই স্বাধীনতা যেমন শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় দর্শকের ক্ষেত্রেও। কারণ শিল্পে দেখা আছে, বর্ণনা নেই। আমরা শিল্পে নানান ব্যাখ্যা খুঁজি। দর্শক যদি স্বাধীন দৃষ্টি দিয়ে শিল্পকে না দেখতে পারে তাহলে শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন হবে না। এখানে শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে নানান সামাজিকতা ও সংস্কার প্রবেশ করছে। তানসেন যখন দীপক রাগ পেয়েছিলেন তখন আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু আজ হয়তো দীপক রাগ আগুন জ্বালাতে পারে না, কিন্তু তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা একধরনের উষ্ণতা অনুভব করব। শিল্পী যদি তার স্বাধীনসত্তা নিয়ে সৃষ্টি করে চলে এবং দর্শক যদি স্বাধীনসত্তা দিয়ে তা উপলব্ধি করে, সেক্ষেত্রে দর্শকও শিল্পী। আমার মনে হয় কোথাও তারা মিলিত হবে এবং সেখানেই ঘটবে শিল্পের সার্থকতা। ■

চিঠিপত্র

এবারের ভোট

ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত ত্রিমুখী। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মতবাদ তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। তেলে-জলে মিশ্রণ! একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস জোট। মাঝখানে বিজেপি।

সাতের দশকের উত্তাল রাজনীতি। কংগ্রেস সরকারের ভয়ে বামপন্থীদের অজ্ঞাত বাস, ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানো। জরুরি অবস্থা। মিসা। নকশাল দমনের নামে উৎপীড়ন। বাম রাজনীতির উপর কংগ্রেসের চরম আঘাত। ফলস্বরূপ '৭৭-এ বাম জমানার আবির্ভাব। আস্তে আস্তে বাম শাসন সুশৃঙ্খল চক্রব্যূহ রচনা করে বাংলার আমজনতাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। সর্বত্র দলতন্ত্র। জমি দখল, ভূমি সংস্কারের নাম করে বর্গারেকর্ড। জমি মালিকরা জানতেই পারলো না তার বর্গাচাষিরা কবে কখন কীভাবে চাষের জমিগুলো নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে। জলের দামে ভাগচাষিদের কাছে জমি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন জমিহারা মালিকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হলো। 'হাল যার মাটি তার'— এই স্লোগানের ফাঁদে পড়ে জমির মালিকেরা সম্পূর্ণ চাকরি নির্ভর হয়ে পড়লো। অন্য দিকে ভাগচাষীরা বুদ্ধির ভুলে লোভে ও দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে জমিগুলো হাতছাড়া করে ফেললো অচিরেই।

বাংলার অধিকাংশ মানুষ পরিণত হলো বামফ্রন্টের দলদাসে। না হয়ে উপায় ছিল না। চাকরি নেই, শিল্প নেই, কুটীর শিল্প নেই, কৃষিবাজার নেই। বছরে দুই একটা সরকারি পদখালি হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়। বামনেতাদের সুপারিশ ছাড়া কারও চাকরি পাওয়ার উপায় নেই। চাই লোকাল, জোনাল, জেলার নেতার চিঠি— সুপারিশপত্র। সুপারিশপত্রের সঙ্গে শুরু হলো টাকার লেনদেন। অ-বামপন্থীদের হাতে টাকা থাকলেও সুপারিশ ছিল না। কাজেই দুটি বিরুদ্ধদলের একীভূত হওয়া কতটা ফলপ্রসূ হবে সেটা বোঝা যাবে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর।

বর্তমানে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা মুখে যাই বলুন দলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল, প্রমোটার রাজ, তোলাবাজি প্রকট। তার উপর নারদ স্টিং অপারেশন তৃণমূলের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারছে না কাকে ভোট দিবে।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারে বিজেপি। বিজেপি আর এস এসের ভাবধারায় চালিত একটি রাজনৈতিক দল কখনো আদর্শচ্যুত হতে পারে না— এটাই আশা করে সাধারণ মানুষ। কালো টাকা ও চিটফান্ড কাণ্ডে আরও অনেক বেশি সরব হওয়া উচিত ছিল বিজেপির। বিজেপি কেন ঢিমেতালে এইসব সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হচ্ছে— সেই রহস্য বুঝতে না পেরে, যারা হাওয়ায় ভেসে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল তারা হাওয়ার তোড়ে পুনরায় ভেসে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে বিজেপির পালে হাওয়া নেই দেখা গেলেও সেটা একেবারে ঠিক নয়। কোচবিহারে বিধানসভা কেন্দ্র মোট নয়টি। কোচবিহারের জেলা বিজেপি নেতৃত্ব সমীক্ষার জন্য, প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে আহ্বান করেছিল। তাতে দেখা যায় মোট তেতাল্লিশটি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। বিজেপির মাটি যদি যথার্থ দুর্বলই হোত তাহলে নয়টি কেন্দ্রের জন্য ৪৩টি আবেদন পত্র জমা পড়তো না।

এবার কে বা কারা সরকার গঠন করবে কেউ হলপ করে বলতে পারবেন না। একদিকে নেতা মন্ত্রীদের বিলাসবহুল জীবন যাপন, অন্যদিকে চা-শ্রমিক, ভাগচাষি, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের হাহাকার। এই গণতন্ত্রের প্রতি ধিক্কার জমেছে আমজনতার মনে। কাজেই দুঃখ, ক্ষোভ, যন্ত্রণার কোন্ প্রকাশ ঘটবে ভোটযন্ত্রে— কেউ জানে না।

—**অশোক কুমার ঠাকুর,**
কামেশ্বরী রোড, পূর্ব কোচবিহার।

দলতন্ত্র নয়, প্রয়োজন গণতন্ত্র

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিককালের কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু, সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পথে হয়নি। তৎকালীন বাম সরকার ভোট প্রক্রিয়াটাকেই এক সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে পরিণত করেছিল। স্পষ্ট করে বলা ভালো নির্বাচনটা এখন শুধু ক্ষমতা দখল করা বা ধরে রাখার একটা রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাই এরাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনমতের ওপর নির্ভর না করে ভোট দখলকেই রাজনীতির মূলমন্ত্র করে ফেলেছে। এরাজ্যের নির্বাচনে পেশীশক্তির প্রদর্শন নতুন কিছু নয়। সর্বগ্রাসী লোভ, ক্ষমতায় থাকার গাজোয়ারিতে ভোট প্রক্রিয়াটাই যেন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র চলছে অরাজকতা। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে প্রশাসনিক মদতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। স্কুল, কলেজ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পাঠশালা। সেখানেও সংসদ নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সংবিধান, গণতন্ত্র সবই আছে। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা যেন কিছুটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

তাই 'তথ্যের অধিকার' আইন সিদ্ধ হলেও ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের যেন জানার অধিকার নেই। মানুষ অস্তিত্ব রক্ষায় বিপন্ন। অর্থাৎ সন্ত্রাস, অধিকার হরণ করার মিলিত প্রচেষ্টা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাই নির্বাচন সম্পর্কেও মানুষ কিছুটা উদাসীন। কিন্তু এই অসহনীয় ও অগণতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। মনে রাখা দরকার যে মানুষ দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রের পূজারি। তাই নির্বাচনে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিফলন দেখতে চায় এরাজ্যের সাধারণ মানুষ।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

দেশাত্মবোধের সংজ্ঞা

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

আজকাল দেখছি দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রায় সব বিষয়েই সেই ব্যক্তিদের মত সংবাদপত্রে প্রকাশ করছে যে বিষয়গুলি তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে। অনেক সময়েই দেখি 'দেশাত্মবোধ' কাকে বলে, 'দেশদ্রোহিতা' কী ইত্যাদি বিষয়ে সিনেমা জগতের লোকদের কথা সমধিক গুরুত্ব পায় প্রকাশমাধ্যমে। তিনি যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতকে গুরুত্ব দেওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? কারণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বাদে কেউই সবজান্তা নয়। গণতন্ত্রে স্বদেশের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানার অনীহা, অজ্ঞতা, সাধারণত সরল অল্প শিক্ষিত মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাব, আরও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে অলস বুদ্ধির মানুষদের সচেতন বা অসচেতনভাবে বিভ্রান্ত করা সহজেই হচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, যাঁরা দেশপ্রেমিক তাঁদের কাছেই আমাদের জানতে চাওয়া উচিত দেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা। আমাদের আগ্রহ থাকা উচিত দেশপ্রেমিক সম্বন্ধে অভিধানে কী আছে খুঁজে দেখতে।

একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র আমির খানের তৈরি 'দেশাত্মবোধের' সংজ্ঞা প্রকাশ করেছে। তাঁর 'দেশাত্মবোধের' সংজ্ঞা হলো 'সমাজ ও মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা।' 'দেশভক্তির জন্য একজনের হৃদয়ে ভালবাসা থাকতে হবে। সমাজ ও জনগণের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।' এই সংজ্ঞাটি দেখে আতঙ্কিত হই। দেশ বলতে যে আমাদের হাজার হাজার বছরের বাসভূমি এই ভাবতবর্ষ সেই বোধটা যাতে না জন্মে, ভারতের ভূমি তথা আমাদের বাসভূমি রক্ষা করা যে দেশপ্রেম, আমাদের বাসভূমি বেদখল হয়ে গেলে যে আমাদের উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র আশ্রয় পেতে যেতে হবে যেমন ভারতবাসীর বাসভূমির অধিকার ১৯৪৭ সালে হরণ করার ফলে প্রায় এক কোটি হিন্দুকে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে হয়েছে, এই বোধ যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর দেশভক্তির সংজ্ঞায় ভারতভূমির কথা নেই। দেশকে বাদ দিয়ে দেশভক্তি? এ কেমন কথা!

অন্য আর একটি দৈনিকে সিনেমা জগতের গীতিকার ও লেখক গুলজারের মত প্রকাশ করেছে। তিনি জে এন ইউ'র বিক্ষোভকারীদের সমর্থন করেন। গুলজার বলেছেন, 'কোনো রাষ্ট্রীয় ইস্যুতে অসম্মতি নিয়ে যখন দেশের যুব সমাজকে সরব হতে দেখি তখন আমি অনেকটাই নিরাপদ বোধ করি।' আমরা মত প্রকাশকে স্বাগত জানাই। আমির খান বা গুলজার মত প্রকাশ না করলে আমরা বুঝতামই না আমাদের দেশে দেশবিরোধী মানুষের সংখ্যা কত। সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার সংবিধানই নাগরিকদের দিয়েছে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে। কিন্তু ভারতবাসীর হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ (প্রস্তর যুগ থেকে) বছরের বাসভূমির অধিকার, অর্থাৎ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার বিরোধিতা তথা দেশদ্রোহিতার অধিকার সংবিধান দেয়নি।

আমরা প্রায় সকলেই কাছে দেখার চশমা পরে আছি। এটাই বিপদ। প্রায় দু' হাজার বছর থেকে পৃথিবীতে ধর্মান্তরকরণ শুরু। ধর্মান্তরকরণে কোনো বাধা নেই, ন্যায়-অন্যায় নেই। হিংসা-অহিংসা, ছলচাতুরিতে কোনো জাতিকে পরাজিত করতে পারলে অসহায় পরাধীন লোকদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে জিজিয়া কর ধার্য করে তাদের ধর্মাচরণের অধিকার হরণ করে, হত্যার ভয়ে ভীত করে, প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে ধর্মান্তর করার কাজটি খুব সহজেই পৃথিবীতে হয়েছে। প্রথম খৃষ্টান সম্রাট কনস্টেনটাইন তৃতীয় শতাব্দীতে ইউরোপ দখল করে মূর্তিপূজারি প্যাগানদের উপর এমনই চাপ সৃষ্টি করলেন যার ফলে ইউরোপে মূর্তিপূজা বন্ধ হলো। অপরদিকে মিশনারিদের ব্যাপাটাইজ করার ফলে প্যাগান ইউরোপ খৃষ্টান ইউরোপ হয়ে গেল ৩০০ বছরের মধ্যে। নবম শতাব্দীতে পারস্য দেশ দখল করল মুসলমানরা। এমন অত্যাচার ও ইসালামিকরণ শুরু করল যার ফলে কিছু লোক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিল বলে তাদের জাতিসত্তা অটুট আছে। কিন্তু যারা আসতে পারেনি পারস্যে ছেড়ে তারা আজ আর নেই। পারসিকরা নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারেনি। পৃথিবীর প্রাচীন অগ্নিপূজারি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মুসলমান শাসনাধীনে ধর্মান্তরতি হতে বাধ্য হবার ফলে। স্বাধীন থাকলে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলে পারসিকদের ধর্মান্তরিত হতে হোত না। প্রাচীন জাতি পারসিকদের জাতিসত্তা আজ নিশ্চিহ্ন হোত না পারস্য থেকে।

বাংলায় ৭৫০ থেকে ১১৫০ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ শাসন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ক্ষত্রিয়েরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। বৌদ্ধ ধর্মে রক্তপাত নেই। বাংলার ক্ষাত্রশক্তির জাগরণ হয়নি ১২৫০ থেকে ১২০৪ সালে। ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে বক্তিয়ার নদীয়ায় যখন এল নদীয়া তখন জনমানবশূন্য। ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ প্রায় ৫৫০ বছর মুসলমান শাসন। তারপর ইংরেজ শাসনে ইসলামিকরণে ভাটা পড়লেও পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলায় ১৮৭২ সালেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো। এর পূর্বে বাংলায় মুসলমান সমাজ ছিল না। হিন্দুরা যদি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারত, বিদেশিরা যদি বাংলায় ঢুকতে ব্যর্থ হোত তবে ১৯৪৭ সালে বাংলার দুই তৃতীয়াংশ জমিতে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হোত না এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালিকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হোত না। সুতরাং দেশপ্রেম বলতে বুঝায় বিদেশি আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাসভূমি রক্ষা করা। তবেই সম্ভব ধর্ম, ভাষা, জাতিসত্তা রক্ষা করা। আগামী ৫০ বছরের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলে পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হবে না কী? ▌

নারী জাগরণে পথিকৃৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বাংলা তথা ভারতের নারী জাগরণের আঁতুড় ঘর বলতে সর্বাগ্রে ঠাকুরবাড়ির কথাই মনে আসবে। প্রাচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের গ্রহণযোগ্য উদারভাবনার সার্থক সমন্বয়ে নারী জাগরণের যে আদর্শ রূপটি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা একদিনে হয়নি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী দিগম্বরী দেবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের যে স্ফুলিঙ্গটি দেখা গিয়েছিল তা পরবর্তীকালে সহস্র দীপশিখার মতো উদ্দীপিত হয়ে দেশকালকে আলোকিত করেছে। ঠাকুরবাড়ির সেই অগণিত দীপশিখার অন্যতমা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর একমাত্র কন্যা তথা রবীন্দ্রনাথের আদরের ভাইঝি ইন্দিরা।

১৮৭৩ সাল শেষ হতে আর দু'দিন বাকি। মহারাষ্ট্রের কালাদগি শহরে জ্ঞানদানন্দিনীর কোল আলো করে জন্ম নিল পরমা সুন্দরী ইন্দিরা। রূপ-গুণের আধার এই মেয়ে ঠাকুরবাড়ির প্রচলিত গৃহশিক্ষার গণ্ডি ভেঙে লরেটো স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ইংরেজি অনার্স ও ফরাসি ভাষা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়েন। বি.এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইন্দিরা দেবীর আগে বেশ কিছু মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেও এঁদের কেউই ফরাসি ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করেননি। শৈশবে কিছুকাল বিলেতে থাকার সুবাদেই হয়তো ইংরেজি ছাড়াও এই সমৃদ্ধ ইউরোপীয় ভাষার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল। ১৮৯৯ সালে সুপণ্ডিত শ্রী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরার বিবাহ হয়। প্রজ্ঞা, বৈদগ্ধে অসামান্য এই দম্পতি সেকালের এক অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন।

শৈশবেই ইন্দিরার প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৯২ সালের 'বালক' পত্রিকায় রাস্কিনের একটি রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন জ্ঞানদান্দিনী। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগেন্দ্রনাথ লাহার অনুবাদের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্কা বালিকার রচনাও ছাপা হলো— লেখিকা 'শ্রীমতী ইঃ'। এই 'শ্রীমতী ইঃ' যে ইন্দিরা তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। শুরু থেকেই তাঁর নিজেকে গোপন করার এই চেষ্টা চিরকাল রয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি সারাজীবনে কী কী লিখেছেন তার কোনো পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। 'বালক' ছাড়াও 'সাধনা', 'সবুজপত্র', 'পরিচয়'— প্রভৃতি পত্রিকায় ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশ হতে থাকে। কবিগুরুর মতে 'তর্জমা মরা বাছুরের মূর্তি' হলেও প্রিয় এই ভাইঝির নানা অনুবাদ যথেষ্ট রসগ্রাহী হয়ে ওঠায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, জাপানযাত্রী ইন্দিরাকে অনুবাদ করতে দেন। এছাড়াও স্বামী প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা'র অনুবাদ 'টেলস্ অব ফোর ফ্রেন্ডস' সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেন মহর্ষির আত্মজীবনী 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর'। এসব বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও ফরাসি জানা ইন্দিরা বহু ফরাসি রচনার বাংলা অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে রেনে গ্রুসের 'ভারতবর্ষ', পিয়ের লোতির 'কমলকুমারিকাশ্রম', মাদাম লেভির 'ভারত ভ্রমণ কাহিনি' এবং আঁদ্রে জীদের 'ফরাসি গীতাঞ্জলির ভূমিকা' এই চারটি অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

এই অনুবাদগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কত যে স্বরলিপি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু সুর এবং স্বরলিপি রক্ষা নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথ্য ও তত্ত্ব দুই-ই ইন্দিরার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে। কত হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীত স্মৃতি থেকে মন্থন করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের বহু গান উদ্ধার করেছেন। এ বিষয়ে কিছু মূল্যবান প্রবন্ধও রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' একটি চিত্তকর্ষক তালিকা যা রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষক মাত্রের কাছেই একটা অমূল্য আকর। শুধু এই বইটিই নয়, আজও রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইন্দিরাদেবীর যে-কোনো সংযোজনের সাহায্য ছাড়া তা হওয়া অসম্ভব। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া'-সহ অগণিত রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন।

কাকা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতেই যে তাঁর চলাচল ছিল তা নয়। দেশী ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম পেয়েছিলেন শৈশবেই। ওস্তাদি হিন্দুস্থানী গান শিখেছেন বদ্রীদাস সুকুলের কাছে। শুধু তাই নয়, পিয়ানো, বেহালা, সেতারে দেশি-বিদেশি সুর বাজাতেন অসামান্য দক্ষতায়। সেন্ট পল্স্-এর অর্গানিস্ট স্লেটার সাহেবের কাছে শিখেছিলেন পিয়ানো, সিনর ম্যাঞ্জাটোর কাছে

বেহালা। স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা 'হিন্দুসঙ্গীত' গ্রন্থটি পড়লে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার আন্দাজ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত সংক্রান্ত 'সঙ্গীত প্রভাত', 'স্বরলিপি পদ্ধতি', 'শান্তিনিকেতনে শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষা', 'হারমনি বা স্বরসংযোগ', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তানের স্থান', 'দি মিউজিক অব্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এরকম আরো আরো অনেক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। তাঁর রচিত কিছু গানও সুরঙ্গমা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কেবল সঙ্গীত-চর্চা, গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ইন্দিরা ছিলেন বাংলার নারী জাগরণের এক মূর্ত প্রতীক। মা জ্ঞানদানন্দিনী, পিসিমা স্বর্ণকুমারী, কাকিমা কাদম্বরী নারী স্বাধীনতার প্রাথমিক বাধা দূর করে যে পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, ইন্দিরা সেই পথে নিজস্ব ছন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষায় বাংলার নারী সমাজের সামনে তাঁর আদর্শ জীবনটাকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরই মধ্যে যে কালচার ফুটে উঠেছিল তা ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তথা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাংলার নারীসমাজের বদ্ধ জলায় ঢেউ তুলতে কাদম্বরীর অশ্বারোহণ, জ্ঞানদানন্দিনীর একলা বিলেত যাওয়া, কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর (সুকুমার রায়ের মাতামহ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দ্বিতীয় স্ত্রী) ডাক্তারি পড়া, জামা, জুতো পরে মেয়েদের খোলা গাড়িতে বেড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ইন্দিরা এঁদের উত্তরসূরী। তিনি সেকেলে রক্ষণশীলতা বা উগ্র আধুনিকতা— দু'এরই বিরোধী ছিলেন। তাঁর নারী স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ছিল— ''সেকালের ধীরা স্থিরাদের সঙ্গে একালের বীরা হতে হবে, অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রী-র সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে— বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন প্রখরে মধুরে মেশা। এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র।'' মুক্তির আলো প্রথম প্রবেশের ফলে প্রাথমিক উত্তেজনায় তাঁর পূর্বসূরীরা কিছু উগ্রতার আশ্রয় নিলেও ইন্দিরার সময় সেই উত্তেজনা যথেষ্ট থিতিয়ে পড়েছিল। ফলে বাংলার নারী জাগরণের নেতৃত্ব দিতে স্ত্রী শিক্ষা, নারী-জাগরণ, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের অধিকার, কর্তব্য, আত্মরক্ষা, সুবিধে-অসুবিধে, কাজকর্ম অর্থাৎ তাদের সামগ্রিক ভূমিকার কথা নিরপেক্ষভাবে ভাবার সময় পেয়েছিলেন। নারী আন্দোলনে তাঁর সুচিন্তিত, মননশীল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নারীর উক্তি'র ছ'টি প্রবন্ধে। এমন শীলিত, ঋজু, স্বচ্ছ প্রবন্ধ ইন্দিরাদেবীর বৈদগ্ধের পরিচায়ক। প্রবন্ধ সাহিত্যের অমূল্য রত্নরূপে সেগুলো আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। মহিলাদের কাজের জন্য উইমেনস এডুকেশন লীগ, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বাংলার স্ত্রী-আচার', 'স্মৃতিকথা', 'পুরাতনী' প্রভৃতির সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও বড় হয়ে উঠেছিল ইন্দিরা দেবীর ব্যক্তিত্ব। কোনো কাজ করে নয়, শুধুমাত্র উপস্থিতি দিয়েই তিনি ভরে দিতে পারতেন সব শূন্যতাকে। অপরূপ লাবণ্যময়ী ইন্দিরা তাই সকলের প্রিয় বিবি-দি'তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সাজসজ্জায়, বাচনে, ঘর সাজানোয়, আচার-ব্যবহার, সাহিত্যচর্চায়, গৃহকর্মে, সবুজপত্র, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সবেতেই তাঁর কালচারের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তিনি সেই জাতের মানুষ যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের দিনযাপনের মধ্যেই সংসারকে মধুময় করে তোলেন। তাঁর আর একটি অবদানের কথা না বললে তাঁর কৃতিত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলীর পাঠক। অন্য কোনো কিছু না করেও কেবলমাত্র কবির কাছ থেকে এই অনন্য সাধারণ চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পারার জন্যই তিনি অমর হয়ে থাকতেন। কাজেই ইন্দিরার অসাধারণত্ব এখানেই। এই অসাধারণ হওয়ার গুণেই রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার পর কুড়ি বছর তিনি রবীন্দ্র ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী তাকে অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত করে। পরের বছরই বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম সম্মানে ভূষিত করে। রবীন্দ্রভারতী সমিতি ১৯৫৯ সালে তাঁকে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী পদক' দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯৬০ সালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপণে বাংলার নারী জাগরণের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

(বরণীয়াদের পদপ্রান্তে, সেবিকা প্রকাশন থেকে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পরম্পরা

আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক
গণপতি চক্রবর্তী

রূপশ্রী দত্ত

যাদুবিদ্যা ভারতের চৌষট্টিকলার মধ্যে একটি। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন— ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক, ভেলকি, ইত্যাদি। অর্থাৎ অদ্ভুত উপায়ে বশীভূত বা মোহাবিষ্ট করা। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ কলার সবকটিতে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে উজ্জয়িনীতে তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মাত্র ৬৪ দিন ছিলেন। ৬৪ দিনেই তিনি ৬৪ কলা আয়ত্ত করেছিলেন।

সত্যিকারের যাদুকররা যাদুবিদ্যাকে অসৎ কাজে ব্যবহার করেন না। লোকেদের আনন্দ দান করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে যাদুবিদ্যা ম্যাজিক নামেই বেশি পরিচিত। হিন্দী শব্দ মজাক থেকে ম্যাজিকে শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। ল্যাতিন 'ম্যাগি' শব্দ থেকেও নাকি ম্যাজিক এসেছে। যার অর্থ কলাকৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের আনন্দদান করা। যাদুবিদ্যা ভারতবর্ষের নিজস্ব বিদ্যা। ভারত থেকে এই বিদ্যা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিংবদন্তী যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী, (২০ নভেম্বর, ১৮৫৮— ১৯৩৯) 'আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক' হিসেবে উজ্জ্বলরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন। পরবর্তীকালের 'যাদুসম্রাট' পিসি সরকার ও কে. লাল গণপতিকে গুরু হিসাবে স্বীকার করেছিলেন।

হুগলীর শ্রীরামপুরের চাতরা গ্রামে গণপতির জন্ম হয়। শৈশবে তাঁর লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল না। গানবাজনার প্রতিই উৎসাহ ও আকর্ষণ ছিল। ১৭/১৮ বছর বয়সে গণপতি হিন্দু সাধুদলের সঙ্গে যোগ দেন। এই সাধুদের প্রভাবে তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মভাব ও অতিপ্রাকৃত অনুভূতির সঞ্চার হয়।

বিস্ময়ের বিষয়, প্রথমে কিন্তু তাঁর যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিকের জগতে পদার্পণ হয়নি। 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এ 'কমেডিয়ান' বা কৌতুকশিল্পী হিসেবেই তিনি কর্মোদ্যোগ শুরু করেন। তারপরই বিস্ময়করভাবে তাঁর কর্মধারা অন্যদিকে বাঁক নিল। বিভিন্ন উৎস থেকে ম্যাজিকের নানা কলাকৌশল তাঁর করায়ত্ত হয়। তাঁর যাদু-অনুষ্ঠানে 'যাদুবাক্স' ও 'যাদুবৃক্ষ' নামে, ম্যাজিকের দুটি অভিনব বিনোদনের আয়োজন ছিল। এই দুটি বিষয়ই দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

১৯০৮ সালে প্রোফেসর বসু-র সার্কাস দলের সঙ্গে তিনি সিঙ্গাপুর যান। সেখানেও তাঁর দেখানো ম্যাজিক প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। 'তাসের খেলা' ও 'অদৃশ্য করার কৌশল' সেখানে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। এছাড়া তাঁর অন্যতম আর একটি যাদু-অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'কংস-কারাগার'। এই অনুষ্ঠানে সংঘটিত বিষয়গুলি দেখে দর্শকদের মনে নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল গণপতি এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

কিন্তু এমন এক বিরল প্রতিভাসম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তির স্বভাবেও এক নেতিবাচক দিক ছিল। সামান্য কারণে তাঁর অতিমাত্রায় ক্রোধের উদ্রেক হোত। সহকর্মীরা জনান্তিকে তাঁকে 'দুর্বাসামুনি' বলতেন।

পরবর্তীকালে প্রোফেসর বসুর সার্কাস পার্টি ছেড়ে নিজের সার্কাস কোম্পানি খোলেন। সেই দলে কিছু প্রাক্তন সহকর্মীও ছিলেন। সমগ্র ভারত ঘুরে 'ম্যাজিক শো' দেখিয়ে তিনি প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জন করেছিলেন।

পরিণত বয়সে, দেশে ফিরে, কলকাতার কাছে বরাহনগরে নিজ গৃহ সংলগ্ন মন্দির নির্মাণ করেন। সেইসময় তিনি অধ্যাত্মচিন্তায় বিভোর থাকতেন। 'যাদুবিদ্যা' নামে তাঁর লিখিত যাদু-সম্পর্কিত প্রামাণ্য পুস্তকখানি পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীরা অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যাদুজগতে পদার্পণের জন্য অপরিহার্য এই পুস্তকটি অধ্যয়ন ব্যতীত সাফল্য অসম্ভব। ❚

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

নবাঙ্কুর

কান্তেশ্বরের রাজপাট

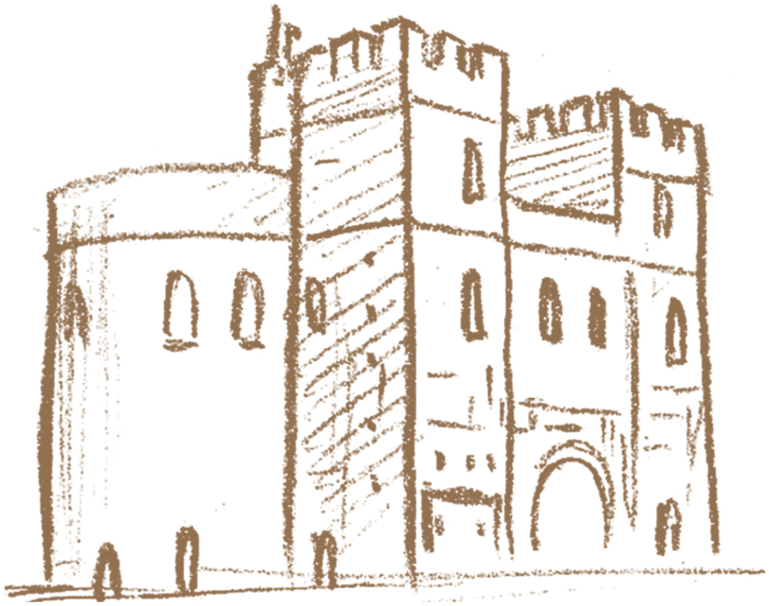

অনেক বছর আগে কামতাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানে বাস করত কান্তনাথ নামে পিতৃহারা এক বালক। দীনদুখিনী তার মা। দুঃখের নেই শেষ। তাদের এই দুঃখ দেখে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের খুব মায়া হলো। তিনি তখন কান্তনাথকে নিজের গোরু চরানোর কাজ দিলেন। রাখাল কান্তনাথ বনে-বাদাড়ে গোরু চরায়। কোনোদিন দুপুর বেলা ক্লান্ত হয়ে পড়লে গাছের তলাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। তারপরে সন্ধ্যে হলে সব গোরু ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিয়ে মায়ের কাছে চলে আসে।

এমনি করে চলে যাচ্ছিল দিন। একদিন স্বপ্নে কান্তনাথ দেখলো দেবী চণ্ডী তার কাছে এসেছে। এসে বলল— কান্তনাথ তুই কাল নদীতে যখন স্নান করতে যাবি তখন সেখানে ভয়ঙ্কর তিনটি জন্তু আসবে। যদি ভয় না পেয়ে একটিকে ধরতে পারিস তাহলে তুই হবি এই কামতাপুরের রাজা। স্বপ্ন পেয়ে কান্তনাথ পরের দিন নদীতে স্নান করতে গেল। জলে নামতেই প্রথমে এলো বিরাট আকারের একটি মকর। লাল তার চোখ। কান্তনাথ তো দেখে ভয়ে মরে। মকর জলে ডুবে গেল। তারপর এলো এক মকরিনী। কান্তনাথ ভয়ে সেও ধরতে পারলো না। তাই দেখে মকরিনী একটু মুচকি হেসে জলে ডুবে গেল। সব শেষে এলো একটি সাপ। কান্তনাথ ভয়ে ভয়ে ধরল গিয়ে সেই সাপের লেজ। দেবী চণ্ডী তখন কান্তনাথকে আশীর্বাদ করে বলল— তুই হবি এই কামতাপুরের রাজা।

দেবীর আশীর্বাদে কান্তনাথ নির্মাণ করল এক রাজপ্রসাদ। কান্তেশ্বর নাম নিয়ে হলেন কামতাপুরের রাজা। গোসানীমারিতে হলো তার রাজধানী। রাজগুরু হলেন সেই আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ। মিথিলা থেকে এলো নানা জ্ঞানীগুণীজন। ধনরত্ন, সেনা-সেনাপতি নিয়ে তৈরি হলো এক বিরাট সাম্রাজ্য।

কোচবিহার জেলার গোসানিমারিতে গেলে এখনো চোখে পড়বে রাজা কান্তেশ্বরের সেই রাজপাট।

বিরাজ নারায়ণ রায়

মনীষী কথা

জগদীশ চন্দ্র বসু

১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। বাবা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। জগদীশচন্দ্র পড়াশুনা করেছেন হেয়ারস্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে। তিনি স্নাতক হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীতে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যান।

লন্ডন থেকে ফিরে এসে পদার্থ বিদ্যায় অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বেতার তরঙ্গ বিষয়ক গবেষণা তার একটি অন্যতম গবেষণা। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' ও 'পলাতক তুফান' তার অন্যতম রচনায ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বল সাধক ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। কলকাতার 'বোস ইনস্টিটিউট' তিনিই স্থাপনে করেছেন।

প্রশ্নবাণ

১. অন্নদামঙ্গল কার রচনা?

২. নাসা-র হেডকোয়ার্টার কোথায়?

৩. মেঘনা কোন্ দেশের নদী?

৪. পশ্চিমবঙ্গের কোথাকার মাটির পুতুল বিখ্যাত?

৫. রাবণের পিতার নাম কী?

উত্তর : ১. ভারতচন্দ্র রায়। ২. ওয়াশিংটন ডিসি। ৩. বাংলাদেশ। ৪. কৃষ্ণনগর। ৫. বিশ্রবা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

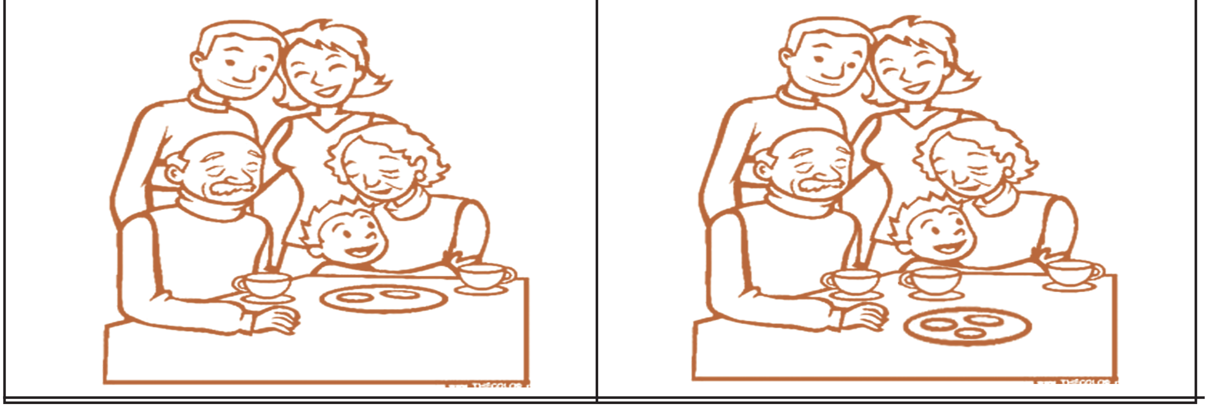

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ত অ শ জা

(২) জা স্ব ত ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ঞ্জ লা কু ক

(২) দা ঙ্গ ত্রা চি

১৮ এপ্রিল সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) কিংকর্তব্যবিমূঢ় (২) অন্তঃসারশূন্য

১৮ এপ্রিল সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) কুঞ্জবিহারী (২) পাঁচফোঁড়ন

উত্তরদাতার নাম

(১) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি (২) সুদীপ্তা রায়, দুর্গাবাড়িপাড়া, গঙ্গারামপুর, দ: দিনাজপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

ভারতীয় মহিলাদের পরম্পরাগত পোশাক শাড়ি

সুতপা বসাক ভড়

আমরা ভারতীয় মহিলারা শাড়িতে যতটা সুন্দর-সাচ্ছন্দ্য বোধ করি, সেটা বোধহয় কোনো মেয়েকে বলে দিতে হবে না। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র মহিলাদের প্রিয় পোশাক শাড়ি বা শাড়ির মতোই পোশাক (যেমন অসমের মেখলা ইত্যাদি)। শাড়ির বৈচিত্র্যও কম নয়। এ কোনো দিন পুরনো হয় না। এ হলো ভারতীয় নারীর চির গরিমাময়ী পোশাক। ধনী-দরিদ্র সবার আয়ত্তের মধ্যে এর মূল্য। আর এর মতো আরামের পোশাক কমই আছে। গরমে, বর্ষায়, সুতির শাড়ির মতো আরামদায়ক আর কিছু হয় না। শীতে একটু মোটা সুতি, সিল্ক, গরদ, মুগা খুবই আরামদায়ক। উত্তর ভারতের কাশ্মীরি মহিলারা আমাদের বাঙালিদের মতোই শাড়ি পরেন। বরফ পরা ঠাণ্ডাতেও তারা গরম কাপড়ের শাড়ি পরে থাকেন, যার নক্শা, কারুকাজ অতুলনীয়। এককথায় , কাশ্মীরি শাড়ি খুবই উচ্চকোটির। একটু মাঝবয়সী থেকে বয়স্কা কাশ্মীরি মহিলা শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাক ভাবতেই পারেন না। আমার খুব কাছ থেকে বেশ কয়েকটি কাশ্মীরি পরিবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতের মহিলারাও শাড়ি খুব ভালবাসেন। সেখানকার সুতি ও সিল্ক দুটোই বিখ্যাত। অসমে শাড়ি, মেখলা বা ওই ধরনের পোশাক আবার পশ্চিমে বারো থেকে আঠারো হাত শাড়ি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে শাড়ির পরিবর্তে পশ্চিমি পোশাকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, ওই দেশের কোনো মহিলার টাইট জিন্স্ প্যান্ট হাসপাতালে গিয়ে কাটতে হয়। কারণ ওই মহিলা কোনোরকমে পোশাকটি পরে নিয়েছিলেন। কিন্তু খুলতে পারেননি। শাড়ির ব্যাপারে এরকম কিছু শোনা যায় না। খুবই ব্যস্ত, অসুবিধাজনক স্থিতি সামাল দিতে সালোয়ার কামিজ পর্যন্ত ঠিক আছে— তবে পশ্চিমি পোশাকের প্রতি এত অদিখ্যেতা তা বোঝা যায় না।

অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি প্যান্টশার্টের সঙ্গে শাড়িকেও দপ্তরে পরে আসার পোশাক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। সুষমা স্বরাজ, স্মৃতি ইরানি, অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, চন্দ্রা কোরে-এর মতো উচ্চপদস্থ মহিলাদের আমরা শাড়িতেই দেখতে অভ্যস্ত। অনেক সময় বিদেশিনীরা শাড়ি পরে নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তখন আবার আমরা তাদের এই বদান্যতায় কৃতার্থ হয়ে যাই। কিন্তু নতুন প্রজন্মের একাংশের শাড়ির প্রতি এই বিমুখতার জন্য পরোক্ষভাবে আমরাই কি দায়ী নই?

প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি প্রকৃতি থাকে। তারা যতদিন পর্যন্ত ওই রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুসারে জীবনযাপন করবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের মঙ্গল। রাষ্ট্রবাসীর প্রকৃতির প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপের অর্থ সেই রাষ্ট্রের সমূহ বিনাশের আমন্ত্রণ। আমাদের দেশের আবহাওয়া, সংস্কৃতির বিচারে মহিলাদের জন্য শাড়ি একটি আদর্শ পোশাক। গরমকালে রোদের তাপ থেকে বাঁচতে যেমন শাড়ির আঁচল মাথায় দেওয়া যায়, তেমনি শীতকালে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে উষ্ণতা অনুভব করা যায়। গুরুজনদের সম্মান জানাতেও ওই আঁচল মাথায় তুলে দেওয়াই আমাদের সংস্কৃতি। জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধে আমাদের জীবনে শাড়ির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে— সেখানে অন্য পোশাক কল্পনা করা যায় না। আবার, মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের নতুন শাড়ি পরার আগে তার থেকে সুতো নিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে উৎসর্গ করে তবেই তা পরতে দেখেছি। আমরাও এই সংস্কার পালন করে চলেছি এবং আশা করব আমাদের সন্তানাদিরাও তা পালন করবে। শাড়ি শুধুমাত্র একটি পোশাক নয়, এটি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, দায়িত্বের প্রতীক। পূজাতে ঠাকুরকে শাড়ি নিবেদন করে আমরা ধন্য হই। কতই বা দাম সেই শাড়ির? অথচ কী অপরিসীম শান্তি পাই, যখন ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়ে ওই শাড়িটি ঠাকুরকে নিবেদন করেন। সেইরকম সামাজিক নানা অনুষ্ঠানেও শাড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচলন আছে।

শাড়ি কেবলমাত্র একটি সুন্দর পোশাক নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাসের গরিমাময়ী প্রতীক। সুতরাং একে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শাড়ির এই মাহাত্ম্য তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। আর যদি আমরা তা না করি, তবে ওরা হারিয়ে যাবে— যেমন করে হারিয়ে গেছে গৌরবময় য়ুনান, মিশর, রোমের বংশধরেরা। পড়ে থাকবে শুধু একটি অতীতের ঐতিহ্যশালী দেশের ভূখণ্ড এবং শক্তিশালী পূর্বপুরুষদের সর্বদা আপোশকারী দুর্বল বংশধরেরা, যারা বিশ্বায়নের তোড়ে হারিয়ে ফেলবে তাদের স্বকীয়তা। ▌

অতিথি কলম

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সঠিক বলে বেছে নেওয়ার মতো কেউ নেই, অনিশ্চিত পরিবর্তন

স্বপন দাশগুপ্ত

প্রবাসী কোনো বাঙালির চোখে বিগত পক্ষকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে এক চরম জ্বালাময়ী রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখ হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাব্যাপী নির্বাচনী প্রচার আক্ষরিক অর্থেই ছিল আগুনঝরা। প্রচার প্রায় শুরুর লগ্নেই তথাকথিত সিন্ডিকেট রাজজনিত অস্বস্তি উসকে দিয়ে ভেঙে পড়ল মহানগরীর মধ্যাঞ্চলে বিবেকানন্দ সেতু। আর এই সিন্ডিকেট ব্যবস্থা রাজনীতির কেষ্ট বিষ্টুদের বলে বলীয়ান হয়ে নাগরিকদের নিত্যদিনের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গেই ধেয়ে এল প্রায় দৈত্যসম বীরভূমে তাঁর সহকর্মী অনুব্রত মণ্ডলের হুঙ্কার ও বিরোধী নিধন করার নীল নকশার সঙ্কেত। এই রৌদ্রতাপিত নির্বাচনী পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক বাতাবরণকে আরও উষ্ণ করতে নির্বাচন কমিশন

> **আজকের বাংলায় যে বৈকল্য বা ত্রুটিগুলি নজরে পড়ছে তার সবেরই সৃষ্টি হয়েছিল বাম আমলের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমদানি করার কারণে। আর ধ্বংসের সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করে দেখিয়েছিলেন বামপন্থী পেটোয়া বুদ্ধিজীবী দল। ... হায়! তৃণমূল আবার এই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতিকে তার নিজের মতো করে আরও নিকৃষ্ট করে তুলছে।**

আসানসোল নিয়ে মমতার বক্তব্যে অনেকটাই বাড়তি তৎপরতা দেখিয়ে ফেলল। যায় কোথায়! আমাদের রগচটা মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল শোরগোল ফেলে দিলেন। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মানবাধিকার কর্মীরাও তাল মিলিয়ে এখানে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ধুয়ো ইতিমধ্যে তুলে দিয়েছেন! এমন একটা সদাচঞ্চল পরিস্থিতি দেখলে কিছুটা দূরে থাকা প্রবাসীর পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পশ্চিমবঙ্গ আবার একটি অনিশ্চিত দোলাচলের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে বা আবার কোনো পরিবর্তনের অনিশ্চয়তায় অপেক্ষমাণ।

তবে এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে বাস্তবিক কতটা মানুষের নিজস্ব পুঞ্জীভূত ক্ষোভের উৎসার বা চলতি ধারা অনুযায়ী নিতান্তই সাধারণ নির্বাচনী 'জুমলা' (বিজেপি'র অমিত শাহ-র কথায়) সেটা আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা বেশ শক্ত। আর বাস্তবে রাজনৈতিক উত্তাপ যে সত্যি সত্যিই প্রথম গ্রীষ্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চরমে উঠছে তা বোঝবার মতো প্রমাণ বা কাহিনিসূত্রও আমার হাতে নেই। তবে শিল্পমহল যাদের মতামতকে আমি অবশ্যই মিডিয়ার মতামতের থেকে বরাবরই একটু বেশি গুরুত্ব দিই। তাদের খবর— কেউই মনে করেন না পশ্চিমবঙ্গে আবার কোনো পরিবর্তন আসন্ন। তবে ভোটিং যন্ত্রগুলিতে মমতা আবার ক্ষমতা ভোগের সুযোগ পাবেন কিনা, নাকি তিনি অবশ্যই পুনর্নির্বাচনের দাবিদার এমন একটা এসপার-ওসপার পরিস্থিতি না হলেও একটা উত্তেজনা বহমান। এর থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় এখানে আদর্শ পছন্দের কেউ নির্বাচনে নেই।

দলীয় ভোটাররা নিজেদের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো কারণে রাজনৈতিক লাইনেই ভোট দেবে— এদের বাইরে যে ভাসমান নির্বাচকমণ্ডলী যাঁরা অন্তিম ফলাফলকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা রাজ্যের চলতি রাজনীতির ধারা নিয়ে অনেকাংশেই অসন্তুষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই অসন্তুষ্টি যা অনেক সময়ই বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে গিয়ে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট জোটকে জিতিয়ে দেবে এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই।

বিবেকানন্দ সেতু ভেঙে পড়ার পর আমরা অবশ্যই মানুষের মধ্যে একটা বিক্ষোভের আঁচ পাচ্ছি যা আত্মম্ভরী তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশেই ধাবিত হচ্ছে। আর বলতে দ্বিধা নেই পাড়ায় পাড়ায়, অঞ্চলে অঞ্চলে সব কিছুকে দলের নিয়ন্ত্রণে রাখার যে অপচেষ্টা সিপিএম করেছিল মমতার দলও ঠিক তাদের হুবহু নকল করেছে।

একথা পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়েই বলা যায় যে কাজ কারবার করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কোনো নির্মাণ কাজ শুরুর ক্ষেত্রে বিগত সিপিএম সরকারের লোকাল কমিটিগুলি যে লেভি আদায়ের সংস্কৃতি চালু করেছিল তৃণমূল দল তার পূর্ণ উত্তরাধিকার গর্বভরে বহন করছে। আজকের যে সিন্ডিকেট রাজের কথা খুব শোনা যাচ্ছে তা আসলে অতীতের লোকাল কমিটিরই নামান্তর। তবে একটা বিষয়ে তফাত রয়েছে যেটাতে মানুষের আরও বেশি অসুবিধে হচ্ছে তা হলো সিপিএম অমলে অনেকটা অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে Single Window সিস্টেম বলে অর্থাৎ একজনকে টাকা দিলেই জরুরি কাজটা হয়ে যেত, এখন একই কাজের জন্য ৫ জন নেতাকে বখরা দিতে হয়।

অবশ্য একটা বিষয় উভয়ের ক্ষেত্রেই এক যে এ রাজ্যে যথার্থ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিতান্তই অভাব। একটা সময় বামপন্থীরা মনে করছিল গ্রামীণ ক্ষেত্রে উপভোক্তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়লে তা আপন নিয়মেই শহরগুলির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করবে। এই পথে চলে জ্যোতি বসু কলকাতা শহরকে রসাতলে যেতে কখনই আটকাননি। তিনি মনে করেছিলেন আগে হোক পরে হোক গ্রামীণ পুনরুত্থান শহরের ওপর এক বহুমুখী বৃদ্ধির প্রভাব ফেলবে।

অন্যদিকে বুদ্ধদেব যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলেন তার উল্টো পথে হেঁটে মমতা কলকাতা শহরের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন। তৃণমূল দলের কলকাতা ও নগরকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে সমর্থনের যে ভারী অংশ রয়েছে তারা যে অবহেলা ও ক্রমিক ক্ষয়ের পথে চলেছিল সেদিক থেকে অবশ্যই অবস্থা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। অন্তত শহরগুলির মুখ পাল্টে দিতে সেখানে নাগরিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যে খরচ এই সরকার করেছে তা অবশ্যই বাম সরকারকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের শিল্পোদ্যোগ আনার ক্ষেত্রে দু'টি দলই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। টাটা মোটরের সিঙ্গুর ছেড়ে যাওয়া যেমন বামফ্রন্টের চরম ব্যর্থতার সূচক, তৃণমূল তেমনি ভোগ করেছে টাটা বিদায়ের ৫ বছরের আফটার শক। শহরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বেশ খানিকটা উন্নতি হলেও বৃহৎ পুঁজি যা ১৯৬৭-৭১-এর মধ্যে বাংলা ছেড়ে চলে যায় তা আজও বাংলায় ফিরতে দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ একমাত্র এই বৃহৎ শিল্পের পত্তনই পারে বহুমুখী উন্নয়ন এক ধাক্কায় ত্বরান্বিত করতে। মমতার খামখেয়ালি পদ্ধতিতে শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা সেভাবে ফলপ্রসূ না হলেও সব দোষটা হয়ত তাঁর নয়। এর মধ্যে একটা বিরাট উপলব্ধিগত ঘাটতি আছে যেটা আগের বামবাদীদের মধ্যেও ছিল।

অবশ্যই কাজে অনীহার একটা চিরাচরিত বিষয় এ রাজ্যের কর্মীবর্গের ক্ষেত্রে বরাবর চালু আছে। অন্যদিকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অনেক কিছু সুযোগ সুবিধে দায়ী করার প্রবণতাও রয়েছে। একটা সময় এই দাবি আদায় প্রায়শই বনধ্-এর চেহারা নিত, অবশ্যই মমতার আমলে সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় স্তরে বামপন্থীদের ক্ষয় হওয়ার ফলে জঙ্গি ট্রেডইউনিয়ন কাজকর্মেও আজকাল অনেক ভাটা পড়েছে। কিন্তু যে বিষয়টার আদৌ ভাটা পড়েনি সেটা হলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রাজনীতিকরণ। এটা বরং বেড়েছে। বাম আমলে রাজনৈতিক ক্যাডারবাহিনী তৈরি করে জনজীবনের পরিসরে নজরদারির যে সংস্কৃতি চালু হয়েছিল মমতা তা পুরোপুরি বহাল রেখেছেন।

নজরে পড়ার মতো বেকার যুবকদের দল বিভিন্ন ক্লাবে ক্লাবে ক্যারাম বা তাস খেলায় ব্যস্ত। তারা অপর্যাপ্ত সময় কাটায় সরকারি মেলা আর উৎসব দেখে। তাদের ক্লাবগুলি সরকারের কাছে মোটা অনুদান পায়। যে অনুদান চলে জনতার করের টাকায়। এ সবই প্রমাণ করে রাজ্যে শিল্পোদ্যোগ নেই। নেই যথাযথ কাজের সুযোগ। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কোনো চিহ্ন নেই। এই প্রসঙ্গে আরও যে সংস্কৃতিটি সদর্পে বেঁচে আছে সেটি হলো রাজনৈতিক হিংসার পরম্পরা। শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষেত্রে রাজ্যকে এড়িয়ে চলার এটি অন্যতম কারণ। এটি বামপন্থীদের মূল্যবান উপহার। হায়! এই উপহারই আজ তাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে কী নিদারুণ সাফল্যের সঙ্গেই না ব্যবহৃত হচ্ছে।

সত্যি কথা না বলে উপায় নেই যে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আজকের বাংলায় যে বৈকল্য বা ত্রুটিগুলি নজরে পড়ছে তার সবেরই সৃষ্টি হয়েছিল বাম আমলের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমদানি করার কারণে। আর ধ্বংসের সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করে দেখিয়েছিলেন বামপন্থী পেটোয়া বুদ্ধিজীবী দল। কমিউনিস্ট আন্দোলন বা ভাবধারা প্রচারের প্রথমদিককার মানুষজন ছিলেন ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত কিন্তু তাদের তথাকথিত বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর পোষিত ঘৃণা থেকে তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন এক ধরনের কর্কশ রূঢ় সংস্কৃতির যারই নিকৃষ্ট অভব্যতম রূপ আমরা বহমান সংস্কৃতির মধ্যে নজর করছি। হায়! তৃণমূল আবার এই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতিকে তার নিজের মতো করে আরও নিকৃষ্ট করে তুলছে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর সাংস্কৃতিক খোঁয়াড়ি যা সদা 'আমরা বঞ্চিত আমরা সর্বহারা' এই বোধকে রোমান্টিক করে তুলে অহর্নিশি ব্যবসায়িক কাজকর্মকে কুকর্মের তকমা দিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করত, তারাই এতদিন ধরে বাংলার রাজনীতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছিল।

এখন দেখার পুনর্নির্বাচিত হয়ে এলে ও সেইসঙ্গে এই সব পুরাতন আর্বজনা ঝেড়ে ফেলাজনিত যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি তা থেকে কাঙ্ক্ষিত এক নতুন মমতাকে কি পাওয়া যাবে? সেটা গবেষণার বিষয়। তবে এত বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় ঝাপটা সামলানো সন্ত্রস্ত মমতার কাছে আগামী দিনে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিছু সম্ভাবনা আশা করা যেতেও পারে। কিন্তু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো কোনো অযাচিত জয়ের ফলে ক্ষমতা পেয়ে গেলে বাম ও কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গকে কেবলমাত্র নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কামান দাগার একটি সামরিক আখড়া হিসেবে ব্যবহার ছাড়া আর তিলমাত্র কিছু করবে না। হায়! ক্রমভঙ্গুর বামপন্থীদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন তাই তালিয়ে যাওয়ার আগে শেষ খড়কুটো। ▌

মধেশি মোকাবিলায় চীনা ড্রাগন!
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে নেপাল

সাধন কুমার পাল

যাকে ভূতে পায় সে বুঝতে পারে না তাকে ভূতে পেয়েছে। নেপালের বর্তমান শাসকদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যটি যেন সত্যি হয়ে উঠেছে। নেপালের মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি মধেশি, থারু ও অন্যান্য জনজাতি সম্প্রদায়ের। নেপালিদের ক্ষোভ বিক্ষোভ যে আসলে নবপ্রবর্তিত সংবিধানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কুলীন নেপালিদের একাংশের ঘাড়ে চেপে বসা আধিপত্য বিস্তারের ভূতের বিরুদ্ধে তা যেন নেপালের বর্তমান শাসকরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছেন না।

নেপালের রাজনীতির রাশ বরাবরই পাহাড়ি উপজাতি, ব্রাহ্মণ ও ছেত্রী সম্প্রদায়ের হাতেই থেকেছে। সমতলের বাসিন্দা মধেশি, থারু ও অন্যান্য জনজাতি ভুক্ত নেপালিরা কোনোদিনই নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করেনি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত এই মানুষগুলির সংখ্যা নেপালের মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। নেপালের পুলিশ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী-তে এদের উপস্থিতি নগণ্য। নতুন সংবিধানে সাতটি প্রদেশের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যাতে নেপালের আইন সভায় নিজেদের কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত করার মতো প্রভাবশালী হয়ে না উঠতে পারে। বৈষম্য রয়েছে এলাকাভিত্তিক আসন বণ্টনের ক্ষেত্রেও। পাহাড়ি এলাকার ৪৯ শতাংশের জন্য ১০০টি এবং তরাই এলাকায় বসবাসকারী ৫১ শতাংশ মানুষের জন্য মাত্র ৬৫টি নির্বাচনী ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

আগের অন্তর্বর্তী সংবিধানে মধেশিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল যা নতুন সংবিধানে নেই। নেপালের তরাই অঞ্চলের মধেশিরা সিংহভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। মোট মধেশি জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র পর্যন্ত নেই। সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় এলাকার সঙ্গে এদের রুটি-বেটির সম্পর্ক। নতুন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর মতো দেশের শীর্ষ পদগুলিতে একমাত্র তারাই বসতে পারবে যাদের মাতাপিতা উভয়েই কিংবা কম পক্ষে একজন নেপালি নাগরিক। অনেক বিশ্লেষকই মনে করেন দেশের শীর্ষ পদে মধেশিদের আটকাতেই সংবিধানে এই ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নাগরিকত্বের ব্যাপারে মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে একই সারিতে বসানো হয়নি। আইন এমন ভাবে করা হয়েছে মহিলারা নিজের পরিচয়ে সন্তানের নাগরিকত্বের দাবি করতে পারবেন না। নেপালের নবপ্রবর্তিত সংবিধানের লিঙ্গভেদে ও জন্মভেদে নাগরিকত্ব প্রদানের মতো বৈষম্যমূলক নীতি বিশ্বের কম দেশের সংবিধানে দেখা যায়।

নেপালের বর্তমান অশান্তি কোনো বিশেষ অধিকারের দাবিতে নয়— পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নেপালবাসীর সমান অধিকারের দাবি আদায়ের জন্য। নেপাল থেকে অনুপ্রবেশের ফলেই দার্জিলিং-য়ের নেপালি সংখ্যাধিক্য, এই নিয়ে লেখালিখি, রাজনৈতিক টিকাটিপ্পনী কম হয়নি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি মেনে দার্জিলিংকে শান্ত করার জন্য গোর্খাল্যান্ড টেরিটরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠিত হয়েছে। নেপালেও কুলীন পাহাড়ি নেপালিদের একাংশের মধ্যেও মধেশিদের ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে কোণঠাসা করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানানোর প্রয়াস অনেকদিন ধরেই চলছে। এত বড় একটি জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে না তুলে জিটিএ ধাঁচের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গড়ে শক্তিশালী নেপাল গড়ার শুভ সূচনা করা যেতে পারতো। অথবা ভারতের পথ অনুসরণ করে সবাইকে নিয়ে চলার মতো সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারতো।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নেপালের বর্তমান সরকার বহুত্ববাদী ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে মধেশি, থারু ও অন্যান্য জনজাতি সম্প্রদায়ের নায্য দাবি মেনে ক্ষোভের আগুন নিভানোর বদলে ভারতকে নিশানা করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ধামাচাপা দিতেই বেশি আগ্রহী। চলতি বছরের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে চীনের সঙ্গে নেপালের ট্রানজিট ও পরিবহনসহ ১০ দফা চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল। দুটো দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি হতেই পারে। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনা করে প্রধানমন্ত্রী খড়্গ প্রসাদ ওলি স্পষ্টত এই বার্তাটিই দিতে চেয়েছেন যে

নেপালের ভারত নির্ভরতা কমিয়ে আনাই এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য।

খড়্গ প্রসাদ ওলি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন সিপিএম (ইউএমএল)-এর চেয়ারম্যান। চীন থেকে ফিরে চেয়ারম্যান হিসেবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত পার্টির পলিটব্যুরোর অধিবেশনে তিনি ১২ পৃষ্ঠার রাজনৈতিক দলিল পেশ করেছেন। এই রাজনৈতিক দলিলে কোনো রাখঢাক না করেই নেপালের নতুন সংবিধান নিয়ে মধেশি ও থারু সম্প্রদায়ের ক্ষোভ বিক্ষোভ উস্কে দেওয়ার জন্য সরাসরি ভারতকে দায়ী করেছেন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের সময় সমঅধিকারের দাবিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মধেশি ও থারু সম্প্রদায়ের অবরোধ, বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় পেট্রোলিয়াম পণ্য, রান্নার গ্যাস; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে নেপালের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রাণহানি হয় ৬০ জন মানুষের।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আসার আগেই আন্দোলনকারীরা ছয় মাস ধরে চলতে থাকা অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। পলিটব্যুরোর অধিবেশনে পেশ করা রাজনৈতিক দলিলে বলা হয়েছে মধেশিদের আন্দোলনের আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। আন্তর্জাতিক মহলের চাপেই নাকি ভারত মধেশিদের মদত দেওয়ার নীতি পরিবর্তন করেছে এবং এই জন্যই নাকি প্রত্যাহৃত হয়েছে ছয়মাস ধরে চলতে থাকা অবরোধ।

নেপাল চীন ও ভারতের মাঝে 'বাফার স্টেট'। সেজন্য শুধুমাত্র কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে নেপালের বর্তমান শাসকদের চীনের সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধি বিশেষ করে দুর্গম পথে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার মতো প্রয়াস নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে বড় চিন্তার কারণ। সব চেয়ে বড় কথা চীনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে অত্যাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ ও অর্থনৈতিক ভাবে ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার যে স্বপ্ন নেপালবাসীকে দেখানোর প্রয়াস হচ্ছে এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

কোনো দেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট চাওয়াটা স্থলসীমা বেষ্টিত নেপালের মতো দেশের মৌলিক অধিকার। ভারত ও বাংলাদেশ নেপালকে প্রয়োজনীয় ট্রানজিটের সুবিধা দিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় দেশ থেকে পণ্য পরিবহণের জন্য ভারত নেপালকে হলদিয়া বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিয়েছে। ভারত সরকার নেপালি প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের আগে ভারত সফরের সময় নেপালকে হলদিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখাপত্তনম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে।

নেপাল সীমান্ত থেকে সবচেয়ে নিকটতম চীনা বন্দর টেইনজিনের (Tainjin) দূরত্ব ৩০০০ কিলোমিটার, যেখানে হলদিয়া বন্দরের দূরত্ব মাত্র ১০০০ কিলোমিটার। নেপালি অংশের অত্যন্ত দুর্বল পরিকাঠামো, সীমান্তের উভয় দিকে দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থার জন্য নেপাল সীমান্তের কেরাং ও চীনা দিকের গেইরং-এর সঙ্গে রেল যোগাযোগ ছাড়া তৃতীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য চীনা বন্দর ব্যবহার করে ট্রানজিটের সুবিধে পাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ রেল যোগাযোগ ছাড়া ট্রাক বা ছোট ছোট পণ্যবাহী গাড়ির মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের খরচে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের জন্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে চীনা বন্দরের ব্যবহার বাস্তবসম্মত নয়। ট্রানজিট, যোগাযোগ ও বাণিজ্যের একমাত্র পথ কোরাং-কে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী করতে সীমান্তের উভয়দিকে পরিকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। চীনা বিশেষজ্ঞদের মতে ২০২০ সালের আগে দু'দেশের মধ্যে এই রেল যোগাযোগ গড়ে তোলা অসম্ভব এবং গেইরং থেকে রেল সম্প্রসারণের কাজ ভৌগোলিক, কারিগরি ও আর্থিক শর্তের উপর নির্ভরশীল একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

নেপাল-চীন বাণিজ্যের আরেকটি পথ তাতুপানি ২৫ এপ্রিল ২০১৫-এর ভূমিকম্পের থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পথটি আবার খোলা হবে কিনা এমন কোনো সঙ্কেত চীনা কর্তৃপক্ষ দেয়নি। তৃতীয় দেশের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের মতে চীন আবার সবুজ সঙ্কেত দিলেও তাতুপানি দিয়ে ছোট ছোট গাড়ির মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের খরচ স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বেশি হবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিষেমবের প্যাকুরেল-য়ের মতে উপযুক্ত কানকটিভিটি ছাড়া ট্রানজিট চুক্তির কোনো অর্থ হয় না। সেই দিক থেকে নেপাল-চীন ট্রানজিট চুক্তিটিকে ঐতিহাসিক চুক্তি কিংবা কার্যকরী চুক্তি কোনোটাই বলা যাবে না।

বর্তমানে ২৪টি ছোট বড় করিডরের মাধ্যমে নেপাল-ভারত বাণিজ্য চালু আছে। চীনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র একটি। ভারত নেপালের সঙ্গে পাঁচটি রেল করিডর স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ-কাঠমাণ্ডু এরকমই একটি প্রস্তাবিত রেল পথ।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিয়ে দেশের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতা আড়াল করার জন্য নবপ্রবর্তিত সংবিধান নিয়ে সৃষ্ট যাবতীয় অশান্তির দায় ভারতের উপর চাপিয়ে নেপালের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী দেশটিকে কার্যত বারুদের স্তূপের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। নতুন সংবিধান প্রবর্তন ও এই নিয়ে অশান্তি সম্পূর্ণ ভাবে নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও এই নিয়ে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ ভারতের সঙ্গে নেপালের উন্মুক্ত সীমান্তের দৈর্ঘ্য ১৭৫০ কিলোমিটার। ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও নেপালের নাগরিকরা ভালো সংখ্যায় রয়েছে। ফলে নেপালে যে-কোনো ধরনের অশান্তির আঁচ ভারতে পড়বেই।

ভারতকে চাপে রাখতে চীন নেপালে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস চালাবে এটাই স্বাভাবিক। নেপালের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে এবং পথের কাঁটা ভারতকে সরাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে চীনকে নেপালের পথ চেনানো। তবে খাল কেটে কুমির আনার ফলে কখনোই ভালো হয় না। এতে নেপালে পাহাড়ি মধেশি ফাটল আরো প্রশস্ত হবে। ইতিহাস বলছে এই ধরনের ফাটল থেকেই জন্ম নেয় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। নেপালের চীনপন্থী গোষ্ঠী ভারত নেপাল সম্পর্ককে খাদের কিনারায় নিয়ে যেতে সদা তৎপর। অতীতেও ভারত-নেপাল সম্পর্কে এরকম টানা-পোড়েন এসেছে। তবুও দুদেশের মানুষের সম্পর্কের রসায়ন তৈরির মূল ভিত্তি কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ ও কাশীর বিশ্বনাথ যতদিন থাকবেন ততদিন এই গভীরতায় এতটুকু আঁচ আসবে বলে মনে হয় না। ▮

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের হাল-হকিকত

হলায়ুধমূলি বাক্‌ড়া

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের পরিচয় কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে। ভারতেই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়। একথা সত্য নয় যে সবুজ বিপ্লব পশ্চিম দুনিয়ার দান। ভারতের কৃষক বহু আগে থেকেই আজকের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদন করে পৃথিবীর মানুষদের ভরণপোষণ করে এসেছে। গো-বংশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিকাশ ঘটেছে এদেশে। সে সময় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করতে হয়নি। গোবর এবং গো-মূত্রের প্রয়োগে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ানো হোত। জমির উৎপাদন প্রক্রিয়া কোনো সময় ব্যাহত হয়নি। তখন আর্থিক সম্পন্নতা থেকে স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্য ছিল। এই কৃষি থেকে গড়ে উঠেছিল পরম্পরাগত এক অভিনব জীবনশৈলী। কৃষি কোনোরকম ব্যবসায় নয়। দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং এই ব্যবস্থা কেবল মানবেরই নয়, প্রাণী মাত্ররই জন্য ছিল কল্যাণকারী।

১৯৪৭ সালের পূর্বে দেশ পরাধীন থাকলেও দেশের কৃষক ছিল স্বাধীন। তার নিজের চাষ, নিজের লাঙ্গল, বলদ, নিজের ঘরের গোবর সার, নিজের সঞ্চিত বীজ, আর ছিল প্রকৃতির দান সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল। সবই বদলে গেছে আজ। এখন কৃষকের জমির কোনো অধিকার নেই, তাই জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। একজন দোকানদার আজকে যে অধিকার ভোগ করেন কৃষক সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। কৃষকের কাজের সহায়ক গো-বংশ এখন বিলুপ্তির পথে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের সরকারি পশুপালন মন্ত্রণালয় ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শূকর পালন ও বিকাশের দপ্তর স্থাপন করেছে এবং সেইসঙ্গে গবেষণাকেন্দ্র ও প্রয়োগশালাও স্থাপন করেছে। অন্যদিকে স্বদেশী গো-পালন ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করেনি। বরং গো-হত্যার প্ররোচনায় আধুনিক কসাইখানা নির্মাণের জন্য বিপুল অনুদানের মাধ্যমে মদত যুগিয়েছে। গো-বংশ হ্রাস পাওয়ায় গত ১৯৫১ সাল থেকে কোটি কোটি টাকার রাসায়নিক সার বহু কোটি টাকার বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানির ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৫১ সালে ভারত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পনীতির উপরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬০-৬১- তে দেশে নিবিড় কৃষি পদ্ধতি প্রকল্প গ্রহণ করে নতুন কৃষি কৌশল প্রয়োগ শুরু হয়। দেশের চিরাচরিত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বদলে নতুন উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্তন ঘটে। কৃষির উৎপাদন অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বৈপ্লবিক ঘটনাকে অনেকেই 'কৃষি বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন। ভারতে এই সবুজ বিপ্লবের পথিকৃৎ ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ। প্রাথমিকভাবে এই রাজ্যগুলির জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ ও কৃষি যন্ত্রায়ন ঘটিয়ে খাদ্যশস্যের অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই রাজ্যগুলিতে কৃষিজাত উৎপাদন পরিমাণে বাড়লেও বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এর পিছনে যে কারণটি কাজ করে তাকে অর্থনীতির ভাষায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বলে। এই নিয়মে উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছনোর পর পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকরণ প্রক্রিয়া নিয়োগ সত্ত্বেও তা থেকে প্রতিদানের পরিমাণ কমতে থাকে। বর্তমানে দেশের আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা একে দেশের শিল্পে বিকাশের স্বল্পগতিকেই দায়ী করেছেন। আর্থিক অগ্রগতিকে ক্রমবর্ধমান রাখতে হলে গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এর জন্য দেশের কৃষি ব্যবস্থার পরিকাঠামো বদলানোর প্রয়োজন।

১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৩৫ শতাংশ হারে এবং খাদ্যশস্য বেড়েছে ৪.৪৭ শতাংশ হারে। কিন্তু গত কয়েকদশক ধরে দেখা যাচ্ছে কৃষির গড়পড়তা বৃদ্ধি দুই শতাংশের কম হয়েছে এবং জনসংখ্যা বেড়েছে ২.২১, ২.২৫ শতাংশ। অর্থাৎ জনসংখ্যা কৃষি উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হারে এগিয়েছে। এর অর্থ হলো যত উৎপাদন প্রয়োজন তত উৎপাদন আমরা করে উঠতে পারছি না। আরো উৎপাদন প্রয়োজন। অন্যদিকে যত শস্য উৎপাদন করার সামর্থ্য আমাদের রয়েছে তার চাইতে কমই উৎপাদন হচ্ছে। সেই ভ্রান্ত অর্থনীতির বিষ ফল ফলছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও। নতুন করে ভাবতে হবে আবার। একদিকে দেশের কৃষি বিজ্ঞানী ও সরকারি কর্তারা কৃষির সম্ভাবনা নিয়ে অসামান্য সব স্বপ্ন দেখান, অন্যদিকে কৃষক না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে। যে চাষি মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মাঠে, সেই 'বেটা চাষা' চাষ করে বিশ্বের বাজারে জায়গা করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তব হওয়া দূরে থাক সন্তানদের পেট চালানোর ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয় না। কেবল টিকে থাকাই কৃষকের কাছে দুরূহ কাজ হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো? তার উত্তর খুঁজতে হবে আমাদেরকেই।

কৃষি উন্নতি না হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত দেশের মোট উৎপাদনে কৃষি অংশ কমে যাচ্ছে। কৃষি থেকে সারাদেশের

মোট রোজগারের জিডিপি (গ্রস ডেমোস্টিক প্রেডাক্ট) ১৬ শতাংশ আসে, আগে প্রায় আয়ের সমস্তটাই আসত। পরিষেবা ক্ষেত্রে আসে ৫৮ শতাংশ, শিল্প থেকে আসে ২৮ শতাংশ। গ্রামীণ এলাকার ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। অতএব সরকার ও বিজ্ঞানিকদের বড় বড় কথা ছাড়া আর বলার কী আছে!

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক এখন ঘোর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। পাঞ্জাবের কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। পাঞ্জাবে মাঝারি এবং উচ্চ উপার্জনশীল কৃষক মোট কৃষকের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি, পশ্চিমবঙ্গে ২২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত দরিদ্র ও দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা ২০ শতাংশ, পাঞ্জাবে সে তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ। যাদের জমি ১ হেক্টরেরও কম পশ্চিমবঙ্গে সেই রকম কৃষকই ৮১ শতাংশ। ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমি ২ হেক্টরেরও কম তারাও ১৪ শতাংশ। পাঞ্জাবের জমির আয়তন বড়। সেখানে নিয়মিত মাটি পরীক্ষা করা হয়। সেখানে কৃষিপ্রযুক্তির ভূমিকাও বিপুল। কৃষি বিদ্যালয়গুলিতে নানা প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয় নানা জাতের বীজ। আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষা নিয়মিত কৃষককে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে সে তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু পরীক্ষা হয় অনিয়মিত। পরীক্ষা হলেও তার ফল পেতে অনেক দেরি হয়। আবার পেলে তার ফলাফল কৃষক উদ্ধার করতে পারে না। এর অর্থ আমাদের কৃষকরা পাঞ্জাবের কৃষকদের মতোই পরিশ্রম করতে পারেন কিন্তু রোজগার করেন অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের বিপন্নতার বড় কারণ জমির আয়তন ছোট। রাজনৈতিক ভাবেও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা কমজোরি। পাঞ্জাবের ধনী কৃষকরা কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজনীতিতে তাদের জোরদার উপস্থিতি। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা অত্যন্ত অসংগঠিত ও দুর্বল। কৃষকদের কোনো অরাজনৈতিক সংগঠন নেই। নানা রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে ভোটব্যাঙ্ক বাড়ায়। কৃষকের স্বার্থের কথা ভেবে রাজনীতি করে না।

ভারতে কৃষিনীতি তৈরি হয় বড় চাষি ও গম চাষিদের কথা মাথায় রেখে। সেখানে ছোট চাষি বা ধান পাটের কথা কেউ তেমন করে চিন্তাও করে না। বিশেষত পাট যার ফলন কেবল পূর্ব ভারতে কৃষি নীতিতে একেবারেই অচ্ছুত। পাট চাষিদের জন্য স্তোকবাক্য ছাড়া কিছুই জোটে না। সরকারি নীতির সুবিধে নিতে না পারা পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের লোকসানের আর একটি বড় কারণ শস্যের বাজার সম্পর্কে কৃষকের কম জ্ঞান।

সার বীজ কীটনাশকের ক্ষেত্রেও চাষি অসহায়। পশ্চিমবঙ্গে সার নিয়ে যা চলছে তা বিগত ভারত সরকারের ২-জি স্পেকট্রামের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শহুরে মানুষ সবজির বাড়তি দাম দিতে নারাজ। এ বিষয়ে কেবল ভারত নয় বিশ্বের প্রখ্যাত (শ্রমনীতি ও কৃষি নীতির) প্রবক্তা স্বর্গীয় দত্তোপন্থ ঠেংড়ীর কিছু কথা তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন, আমরা যখন কৃষি উৎপাদনের জন্য ন্যায্য মূল্যের দাবি করি, তখন সরকার ও তার লোকেরা বলেন— যে এই দাবি পূরণ করলে উপভোক্তার উপরে বোঝা বাড়বে। ইংরেজ দেশ থেকে চলে গেছে, ইংরেজিয়ানা থেকে গেছে। ইংরেজের নীতি ছিল 'বিভেদনীতি চালাও এবং শাসন কর'। আজ এই নীতিই চলছে। যার ফল হলো কোনো সরকারই কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম দেয় না বা দিতে চায় না। একথা সর্বাংশে সত্য যে, দেশের কৃষকেরা যতদিন তাদের ফসলের লাভজনক দাম না পাবে ততদিন দেশের সার্বিক উন্নয়ন হবে না— একথা সবাইকেই ভাবতে হবে। কৃষকের চাষ যখন লাভজনক হচ্ছে না তখন শিল্প বা আবাসন বা ব্যবসায়ীদের কাছে জমি বেচে দেওয়াই কি ভাল? পশ্চিমবঙ্গের কৃষকও একথা ভাবতে শুরু করেছে। অকৃষি জমি এ রাজ্যে অনেক কম। এখানে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুলের জমি চাষিদের দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কৃষির সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। সারা ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের বেশি নয়। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৩.৩৯ শতাংশ বেড়েছে। সীমান্ত এলাকায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সর্বাধিক। প্রায় এক কোটি গত কয়েক বছরে। এর গভীর প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ কৃষিতে। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক রিপোর্টে তা প্রকাশ পেয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গের ২০টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আফ্রিকার গরিব দেশগুলিকেও হার মানায়। কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রামের কৃষকদের জোয়ান ছেলেরা ভিন প্রদেশে পাড়ি জমিয়েছে কাজের জন্য। গ্রামীণ কৃষিকাজ প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটে সরকার বদলায় কিন্তু কৃষকের ভাগ্য বদলায় না। কৃষকের ভাগ্য বদলাতে অতি অবশ্যই কৃষি পরিকাঠামোর পরিবর্তন আবশ্যক। কোনো সরকারই আজ অবধি এ কাজ করেনি। নির্দিষ্ট না হলেও রাজ্যে কৃষিনীতি যা আছে তা কার্যকরী করতে সরকারি বিনিয়োগ কোনো সরকারই করেনি। বাম আমলে ২০০৩-২০০৪ সালে রাজেরে শস্য ঘাটতি ছিল আড়াই লক্ষ টন। ২০০৫-২০০৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। তাই এখন গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র কাজ হলো সরকারকে কৃষিপরিকাঠামো পরিবর্তন করা। আধুনিক কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে চিরাচরিত গো-ভিত্তিক কৃষির সমন্বয় ঘটানো সরকারের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত।

আধুনিক চাষ পদ্ধতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থের প্রয়োগ জীবজগতকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্ক আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীরা বলেছেন গোবরসার,গো-মূত্র বর্তমানেও কৃষিকাজের যথেষ্ট উপযোগী। তাহলে বিষহীন খাদ্য ও দূষণহীন শুদ্ধ পরিবেশ গড়ে উঠবে আবার। মানুষ সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। তার জন্য সর্বোপরি কৃষিকাজের উপকরণাদির সহজলভ্য ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমেই পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা চাই, উপযুক্ত ফসলের উপযোগী, উৎকৃষ্ট ফলনশীল বীজ, উর্বরা জৈব সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিজাত ফসলের সংরক্ষণ ও বিপনণের ব্যবস্থা গড়ে তুলে কৃষির বিকাশকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালু করতে হবে। নতুবা আগামী দিনগুলিতে ভয়ঙ্কর খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। ▌

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যথাযথ সুযোগ পেলে একজন বনবাসী মেয়েও সাফল্যের চূড়ায় উঠতে পারে তা করে দেখিয়ে দিল কবিতা রাউত। মহারাষ্ট্রের নাসিকের হারসুলের নিকটবর্তী সাওরপাড়া গ্রামের মেয়ে কবিতা। ছোটো থেকেই খেলাধুলার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। সেই সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া ও শহরজীবনের ছোঁয়া পাওয়া। মূলত ওই গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই ছোটোবেলায় থানাপাড়া বোর্ডিং স্কুলের ওই মেয়েটিকে খেলাধুলার জগতে নিয়ে আসে। এইভাবে আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দিতেই একদিন সে চোখে পড়ে যায় বিজেন্দ্র সিং-য়ের। অ্যাথলেটিক্সকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করার জন্য কবিতাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন বিজেন্দ্র। কিন্তু যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা, সেই পরিবারের মেয়ে কিনা মাঠে যাবে দৌড়তে! তাছাড়া গরিব পরিবারের সাতকুলের কেউই এপথে পা বাড়ায়নি। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার মা-বাবা কেউই চাননি কবিতা খেলাধুলা করুক। কিন্তু অবশেষে মেয়ের অদম্য জেদের কাছে হার মানতেই হলো বাবা-মা-কে। এতে অবশ্য সময় লেখেছিল দু'বছর।

সাওরপাড়া এক্সপ্রেস
কবিতা রাউত

অনুমতির জট কাটতেই প্রশিক্ষণের জন্য বিজেন্দ্র কবিতাকে নিয়ে এলেন নাসিকে। কিন্তু এখানে থাকার খুব সমস্যা হওয়ায় তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং এই বনবাসী মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতোই প্রতিপালন করতে থাকেন। এই সময়ই কবিতার আসল প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বিজেন্দ্রর স্নেহ ও কঠোর প্রশিক্ষণে তিন মাসের মধ্যেই সে জাতীয় চ্যাম্পিয়নে উন্নীত হয়। পরবর্তীকালে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্যাম্পে থাকার সুযোগও জুটে যায় তার। এরপর তাকে অবশ্য আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে কমনওয়েলথ গেমস্, এশিয়ান গেমস, ২০১০ এর ৮ অক্টোবর নিউ দিল্লীতে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমস-এ ১০ হাজার মিটার ৩৩ মিনিট ০৫ সেকেন্ডে শেষ করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম উঁচুতে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমনওয়েলথ গেমসে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে পদক জিতেছেন।

২০১০ কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কবিতাই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পদক জিতেছেন। এর ওই বছরই নভেম্বর ৩১ : ৫১ : ৪৪ দৌড়ে এশিয়ান গেমসে জিতেছেন রুপার পদক। আর অতি সম্প্রতি গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ১২তম সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে ২০১৬-র রিও অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন। রিও গেমসে কোয়ালিফাই করার জন্য মহিলা দৌড়বিদদের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। কিন্তু কবিতা নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট আগেই ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে ওপি জৈশ, ললিতা বব্বর এবং সুধা সিং-য়ের সঙ্গে রিও আলিম্পিকে যাওয়া একেবারে পাকা করে ফেলেন। কবিতাই একমাত্র প্রতিযোগী যে ১২তম সাউথ এশিয়ান গেমস থেকে অলিম্পিকে যাওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলেন।

দৌড়ানোর নেশা যার শিরায় শিরায় সেকি কখনও থেমে থাকতে পারে? কতকগুলো পদক পেয়ে থেমে না থেকে তারই মতো বনবাসী মেয়েদের খেলাধুলার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার জন্য ২০১১ সালে নাসিকে প্রতিষ্ঠা করেন একলব্য অ্যাথলেটিক্স অ্যান্ড স্পোর্টস ইনস্টিটিউট। আর তাঁর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে স্থানীয় লোকজন, চিকিৎসক, রাজ্য সরকার সবাই যুক্ত হয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সাহায্যের হাত। ক্রীড়াক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ২০১২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার পান। আর কবিতার হাত ধরেই ৩০ বছর পর মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে অর্জুন পুরস্কার জুটলো। কবিতা এখন মহারাষ্ট্রে সাওরপাড়া এক্সপ্রেস নামেই বেশি পরিচিত।

গরিব উপজাতি পরিবারের মেয়ে কবিতার সাওয়ারপদা থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের যাত্রাপথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কবিতা বর্তমানে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনে কর্মরতা। তা সত্বেও সে স্পোর্টর্স ট্র্যার্ক ছাড়েনি। রিও অলিম্পিকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি সে আরো অনেক বনবাসী মেয়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে কিছু করার। এমনকী ভবিষ্যতে ভারত যাতে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরো উজ্জ্বল তারকা পায়, তারও নীরব প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন কবিতা। দেশবাসীর আশা, কবিতা ২০১৬ রিও অলিম্পিকে পদক জিতে আমাদের দেশকে আরো গর্বিত করবে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

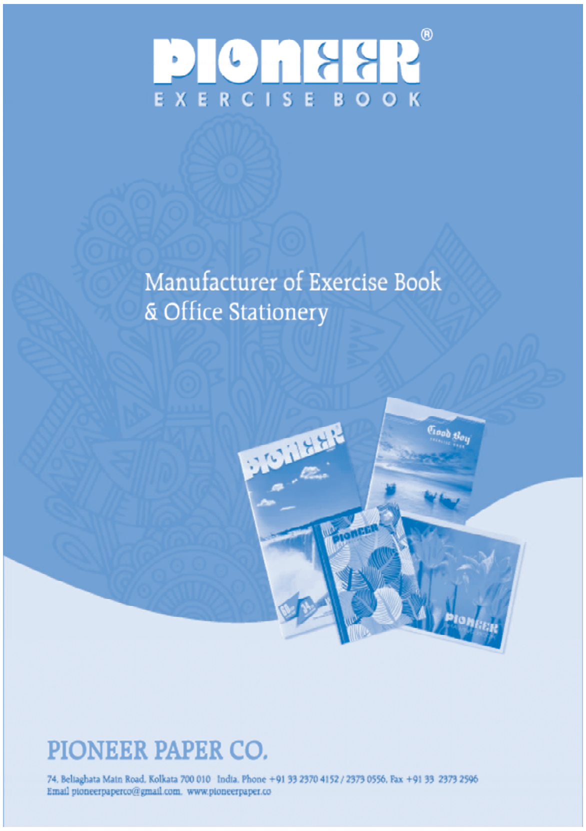

‘চারুকলা তাই আধ্যাত্মিক বাণীতে পূর্ণ। আর আজকের দিনে ভারতের এই হল জাতীয়তার বাণী। যদি এই বাণী প্রচার করতে হয়, তবে চিত্রশিল্পীর বৃত্তিকে শুধুমাত্র জীবিকা হিসাবে নয়, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার উপায়গুলির অন্যতম মনে করে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচতে হলে

সরোজ কুমার ভড়

শরীর ঠিক রাখতে হলে, সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচতে হলে নিয়মিত শরীরচর্চা করা অবশ্যই দরকার। আর যে বয়সে যে রকম শরীর চর্চা দরকার, সেই রকমটাই করা দরকার।

অনেকেই আমরা খেলাধুলা করি, ব্যায়াম করি, 'জিম'-এ যাই, সাঁতার কাটি, আসন করি, হাঁটা-হাঁটি করি— এ সবই শরীরচর্চা। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে এই সব শরীরচর্চা ঠিকঠিক ভাবে করা যায় না। আবার সময় মতো খাওয়া-দাওয়াও হয়ে ওঠে না। যে বয়সে যে যে জিনিস খাওয়া দরকার তার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি ভোগের রাস্তায় চলি। কিন্তু ভোগটাও যে যোগপূর্বক করা দরকার সে কথা মনে থাকে না। কেউ কম খাই, কেউ বেশি খাই, প্রতিদিন জল যতটা পান করা দরকার তা হয়তো করি না, আবার কেউ কেউ কতকগুলি নেশায়ও আসক্ত হয়ে গেছি যেমন— চা, পান, ধূমপান, অন্যান্য খাদ্য যেমন তেলে ভাজা, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি। কোন কোন রোগ থাকলে কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় না বা কোন কোন রোগের জন্য কোন কোন জিনিস খেতে হয়— তা ভেবেও দেখি না। পশুরাও কত নিয়ম মেনে চলে, যেমন বাঘকে দশ কেজি ঘাস দিলে সে খাবে না আবার গাধাকে দশ কেজি মাংস দিলে সে খাবে না। আর আমরা কিন্তু প্রায় সব কিছুই সময়-অসময় চিন্তা না করেই খেয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ অনিয়মের শেষ নেই। এক কথায় বলা যায় আমরা প্রত্যেকেই যেন 'জ্ঞানপাপী' হয়ে উঠেছি। আবার একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে, শরীরের মধ্যেই থাকা রোগের জীবাণুগুলি মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। তখন নিজে এবং পরিবারের সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কী করা যায় চিন্তা করতে থাকি। শরীরটা তখন নিজের কাছে একটা 'বোঝা' হয়ে ওঠে। সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচা তো দূরের কথা এই মুহূর্তে কূলকিনারা খুঁজে না পেয়ে বিভিন্ন মানুষ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ নিতে থাকি। কেই বা কত জানে শরীরকে সুস্থ করে তোলার পথ? বিভিন্ন মানুষ তাদের ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে থাকেন। আবার যতজনের কাছে যাই না কেন ততজনই ততরকম পরামর্শ দিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেন।

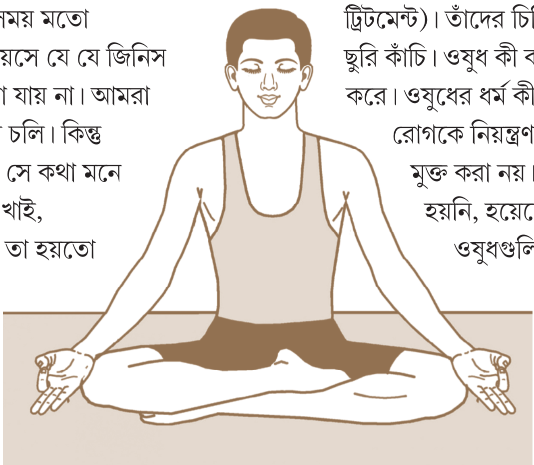

একথা ঠিক যে বর্তমানে আমরা প্রায় প্রত্যেক মানুষই কমবেশি অসুস্থ। আমাদের শরীর অসুস্থ হলে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আমরা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিই এবং ওষুধ প্রয়োগ করি। কিন্তু তাতে যদি ঠিক না হয় তার জন্য আমরা ডাক্তারবাবুর না হয় ওষুধের দোষ দিই। কিন্তু কারোরই দোষ নয়। ডাক্তারবাবু তাঁর ডাক্তারির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা রোগীর লক্ষণগুলি দেখে বুঝে চিকিৎসা করেন (সিস্টেমেটিক ট্রিটমেন্ট)। তাঁদের চিকিৎসার মাধ্যম হলো ওষুধ অথবা ছুরি কাঁচি। ওষুধ কী করে? ওষুধ তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে। ওষুধের ধর্ম কী? ওষুধের ধর্ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা (কনট্রোল), রোগ একেবারে মুক্ত করা নয়। ধরুন আমার কোনো জটিল রোগ হয়নি, হয়েছে অম্বল (অ্যাসিডিটি), তার জন্য যে ওষুধগুলি সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করা হয় সেগুলি হলো— রিস্ট্যাক্, র‍্যানট্যাক্, হিস্ট্যাক, ডাইজিন ইত্যাদি। কিন্তু তাতে কি 'অম্বল' চিরতরে বিদায় নেয়? না, আবার কয়েকদিন পরে তা দেখা দেয়। ওষুধগুলি কিন্তু আবিষ্কার করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, সাধারণ মানুষ নয়। যাই হোক, ওই ওষুধগুলি তাদের ধর্ম অনুযায়ী কাজ করেছে।

আমাদের শরীরে যে চক্র (সিস্টেম) গুলি রয়েছে যেমন— (১) মূলাধার চক্র (Reproductory System), (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র (Excretory System), (৩) মণিপুর চক্র (Digestive System), (৪) হৃদয় চক্র বা নিম্নমনস চক্র (Skeleton System), (৫) অনাহত চক্র (Circulatory System), (৬) বিশুদ্ধি চক্র (Respiratory System), (৭) আজ্ঞাচক্র (Nervous System), (৮) সহস্রার চক্র (Endocrine System), ইত্যাদির মধ্যে কোনো কোনোটির গোলমাল হওয়ার কারণে আমাদের শরীরে রোগ হয়ে থাকে। তাই এই চক্র বা সিস্টেমগুলিকে যদি ঠিক করে নেওয়া যায়, তাহলে রোগ ঠিক হয়ে যায়, এমনকী চিরকালের জন্য বিদায় নিতে পারে। কিন্তু এই সিস্টেমগুলি ঠিক হবে কী করে? ঠিক হবে সিস্টেমিক্ ট্রিটমেন্টের দ্বারা।

সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট কী? সিস্টেমিক্ ট্রিটমেন্ট হলো বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে কায়িক পরিশ্রম করা, শারীরিক কার্যক্রম করা, সর্বোপরি যোগ প্রাণায়াম করা। ■

পুস্তক প্রসঙ্গ

গান্ধীজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

অতি সম্প্রতি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কিছু বিশ্লেষাত্মক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ‘একটি অকপট জীবনী— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী’, মনোজ দাস লিখিত ‘মহাত্মা গান্ধী কেন মহাত্মা নন’, অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী রচিত ‘গান্ধীজীর অপকর্ম’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে লেখকেরা গান্ধীকে ঘিরে যে মিথ তৈরি হয়েছে তা ভেঙে দিয়েছেন। বর্তমানে আলোচ্য অমলেশ মিশ্র লিখিত ‘গান্ধীচরিতমানস (পোষ্টমর্টেম)’ এই ধারার একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। ৫৯২ পৃষ্ঠার মহাভারত সদৃশ এই বিশাল গ্রন্থে লেখক এম কে গান্ধীর শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কর্ম জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তাঁকে ঘিরে যে মিথ তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। সুদীর্ঘ ৩৫টি অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রী মিশ্রের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হলো— (১) গান্ধীর আন্দোলনগুলির পিছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না এবং সেগুলি ন্যায্য কারণেই ব্যর্থ হয়েছিল। (২) গান্ধী দেশের স্বাধীনতা আনেননি। (৩) গান্ধী কোনোক্রমেই জাতির পিতা নন। (৪) গান্ধী এতটুকু অহিংস ছিলেন না। (৫) গান্ধী নিজের স্বার্থে অন্যদের বলি দিয়েছেন। (৬) গান্ধী আত্মপ্রচার সর্বস্ব ছিলেন। (৭) গান্ধী বৃটিশ সরকারকে সর্বদা সমর্থন করেছেন। (৮) তিনি একতরফা ভাবে মুসলমানদের তোষণ করেছেন এবং হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমর্থন শুধু নয় প্রশংসা করেছেন। (৯) মুসলমান দুষ্কৃতীরা হিন্দু মহিলাদের উপর যৌন নিগ্রহ করলে তিনি মহিলাদের বিনা প্রতিবাদে তাদের লালসা চরিতার্থ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। (১০) তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে ক্যারিয়ারিষ্ট এবং ক্যারিয়ার তৈরি করতে কোনো নৈতিকতার ধার ধারতেন না। (১১) গান্ধীর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সত্যপরীক্ষার কথা বলেছেন অথচ পদে পদে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। (১২) গান্ধী দেশভাগ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন অথচ এমন ধারণা সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি দেশভাগ চাননি। (১৩) তাঁর সামান্যতম পড়াশোনা ছিল না।

এই সব মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক শ্রী মিশ্র অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। উঠন্তী মুলো পত্তনেই চেনা যায় এই সত্য মনে রেখে

তিনি গান্ধীর বংশ পরিচয় ও গান্ধীর শৈশব জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক দেখিয়েছেন শৈশব থেকে এম কে গান্ধী ছিলেন অপদার্থ, কপট ও ভণ্ড। শুধুমাত্র ধূর্ততা, কপটতা ও আত্মপ্রচারকে সম্বল করে তিনি ভবিষ্যত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লেখক দেখিয়েছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছিল যেখানে তিনি জীবনের এক চতুর্থাংশ কাটিয়েছিলেন সেখানে তিনি প্রচণ্ড মুসলিম প্রীতি ও বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে হিন্দুবিদ্বেষ। গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন ও সময়ের পরিচয় দিতে গেলে গান্ধীপূর্ব মডারেট কংগ্রেস এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ধারার পরিচয় দিতে হয়। লেখক একজন আপাদমস্তক ঐতিহাসিক হওয়ার দরুণ এই দিকটা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া শ্রী মিশ্র সবিস্তারে নাথুরাম গডসে সম্বন্ধে লিখে গডসে কী পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী হত্যা করেছিলেন সে বিষয়ে পাঠককে অবহিত করেছেন যেটা খুবই উচিত হয়েছে। মোট কথা ধূর্ত কপট ভারতের অখণ্ডতার সবচেয়ে বড় শত্রু গান্ধীকে জানার জন্য এই গ্রন্থের ভূমিকা অসাধারণ। এমন গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা খুবই প্রয়োজন। আমরা এই গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ দেখতে আগ্রহী। আশা করি লেখক ও প্রকাশক আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

গ্রন্থটি আগাগোড়া গবেষণামূলক, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটিতে অযত্নের ছাপ রয়ে গেছে। লেখক অনেক জায়গায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আকর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি, যদি বা কখনো করেছেন পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করেননি। ফলে সন্ধানী পাঠকদের অতৃপ্তি থেকে যায়। লেখক জায়গায় জায়গায় বড্ড বেশি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা লিখন সংক্রান্ত শৃঙ্খলার পরিপন্থী। (‘গান্ধী চরিতমানস’ গ্রন্থ শিরোনামের উপশিরোনাম ইংরেজি ‘পোষ্টমর্টেম’ কেন? (‘পোষ্টমর্টেম’-এর বাংলা দেওয়া যেত না?) সবশেষে বলি গ্রন্থ শেষে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। আর, ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট খুবই জরুরি ছিল। গ্রন্থটি খুবই উচ্চ মানের বলেই এই ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেওয়া হলো। আশা করি আগামী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা হবে।

গান্ধীচরিতমানস (পোষ্টমর্টেম) লেখক—অমলেশ মিশ্র। প্রকাশক : দে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬। মূল্য : ৬০০ টাকা।

সমাবেশ সমাচার

সংস্কার ভারতীর দেওয়ালপঞ্জি উন্মোচন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩-এর প্রাক্ সন্ধ্যায় গত ১৩ এপ্রিল আকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জির উন্মোচন। লোকার্পণ করলেন ওড়িশি নৃত্যশিল্পী অলকা কানুনগো। দেওয়ালপঞ্জির এবারের বিষয় ভারতের নদ-নদী। হিন্দুকুশ পর্বত জলবিভাজিকা হিসাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিকে বিভক্ত করেছে। নদীগুলির উৎস, গতিপথ, নদীতীরে গড়ে ওঠা শহর, দর্শনীয় স্থান, বাঁধ, জলপ্রপাত ইত্যাদির বর্ণনাসহ চিত্র দেওয়ালপঞ্জিতে স্থান পেয়েছে।

অলকা কানুনগো তাঁর বক্তব্যে সংস্কার ভারতীর প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন সংগঠনের কাজ যেন আগামীদিনেও সাবলীল জলধারার মতো প্রবাহিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা বিকাশ ভট্টাচার্য, সহসভাপতি সাহিত্যিক ও বক্তা গুরু বিশ্বাস। কার্যক্রমে গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব ভদ্রা বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে গৌড়ীয় নৃত্য 'গণেশ বন্দনা' (পরিচালনা— কাবেরী কর পুইতণ্ডী) এবং নাটক 'চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত' (পরিচালনা— সুকুমার পতি) মঞ্চস্থ করেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীবৃন্দ। সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর সঙ্গীত শিল্পীরা।

পুরুলিয়ায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক মহোৎসব ও হিন্দু ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পুরুলিয়া শাখার বার্ষিক মহোৎসব ও হিন্দু ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২০, ২১ ও ২২ এপ্রিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্তগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক ও পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের জামশেদপুর শাখার অধ্যক্ষ স্বামী শুভ্রানন্দজী মহারাজ, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, দুর্গাপুর শাখার অধ্যক্ষ স্বামী জীবাত্মানন্দজী মহারাজ ও দুমকা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যব্রতানন্দজী মহারাজ। ২১ এপ্রিল সঙ্ঘের মহোৎসবের প্রচারের উদ্দেশ্যে এক বিরাট শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রায় বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল শান্তিযজ্ঞানুষ্ঠান ও গুরুমহারাজ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের পূজারতির পর এই মহোৎসব ও হিন্দু ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

সামসীতে বিদ্যাভারতীর চাঁচল সঙ্কুলের কর্মশালা

বিষয়ভিত্তিক ধারণার নিপুণতা এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কৌশলের মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে আচার্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয় গত ২৪ এপ্রিল সামসীতে। এদিন সামসী এগ্রীল হাইস্কুলের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় চাঁচল সঙ্কুল আচার্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই কর্মশালায় চাঁচল সংকুলের চাঁচল, কলিগ্রাম, গোবিন্দপাড়া, সামসী গাজোল পাকুয়াহাট-সহ ৬টি সরস্বতী শিশুমন্দির থেকে ৬৭ জন আচার্য-আচার্যা অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ বিদ্যাভারতী বোর্ডের সংযোজক আনন্দমোহন তরফদার বলেন, প্রতিবারের মতো এবছরও এদিন বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সংস্কৃত এই চারটি বিষয়ে কর্মশালা হয়। এদিনের এই কর্মশালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ বিদ্যাভারতী বোর্ডের সহ-প্রশিক্ষণ প্রমুখ কেশবানন্দ পাল, প্রধান অতিথি ও ইংরেজি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তথা কর্পূরগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. কল্যাণ পাণ্ডে, বাংলা বিষয়ে সামসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোজ ভোজ, সংস্কৃত বিষয়ে সামসী হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক স্নেহাশিস পাল (ছোটু) এবং গণিত বিষয়ে ভিঙ্গোল হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সুকান্ত ঘোষ।

ক্রীড়া ভারতী আন্তঃ বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা

গত ৯ ও ১০ এপ্রিল উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকানন পার্কে ২ দিন ব্যাপী দিবারাত্রি আন্তঃ বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা খুব উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ১৬ টি স্কুল থেকে ১৭৬ জন খেলোয়াড় এবং ১৬ জন প্রশিক্ষক অংশ নেন। লায়নস ইন্টারন্যাশনালের আর্থিক সহায়তায়, ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে এবং কবাডির প্রাচীনতম ক্লাব নতুন বাজার অশোক সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় এই কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত খেলোয়াড়কে টি-শার্ট ও একটি করে কলম দেওয়া হয়। ১৬টি স্কুলকে স্পনসর করে লায়নস ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের ১৬টি জেলা। অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত দুদিন পূর্ণ সময় উপস্থিত ছিলেন। লায়নস ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর অশোক পারীখ বিজীয়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এছাড়া ক্রীড়া ভারতী প্রদেশের ও ক্ষেত্রের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈদ্যবাটিতে সঙ্ঘের রক্তদান শিবির

একদিকে মানুষের সীমাহীন অর্থলিপ্সা, চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতা যখন মানুষকে অসহায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তখন আবার মানুষই এগিয়ে আসছে বিপন্ন মানুষের পাশে সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে। এরকমই একটি মানবিক দিক প্রকাশ পেল শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাজে। যদিও এরকম কাজই তাদের ব্রত। গত ৩১ মার্চ কলকাতায় গণেশ টকিজের কাছে উড়াল পুলের একাংশ ভেঙে যাওয়াই অনেক মানুষ মারা যান। আহত অনেক মানুষ লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে হাসপাতালের বিছানায়। তাদের সাহায্যে গত ৩ এপ্রিল সঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় স্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যা নিকেতনে। শুরু হয় সকাল ১০টা নাগাদ। শেষ হয় দুপুর ২.৩০ নাগাদ। প্রায় ১০০ জন রক্তদান করেন, তার মধ্যে ৯ জন মহিলা। রক্ত গ্রহণ করে লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্ক। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভানেত্রী রাজকুমারী কেশরী যিনি বর্তমান রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনে চাঁপদানী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজকুমারী দেবী রক্তদান শিবিরের ভুয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী-সহ বিভাগ প্রচারক বরুণশঙ্কর ঠাকুর।

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

কাঁটাতার দেশভাগের বাস্তব ছবি

বিকাশ ভট্টাচার্য

মনুষ্যকৃত দেশভাগ নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেনে নেননি। নেহেরু, জিন্না ও গান্ধীর ইচ্ছায় যে কাঁটাতারের বেড়ার দেশভাগ তা আপামর বাঙালিকে আলাদা করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মুকুন্দদাস, জীবনানন্দকে ভাগ করতে পারেনি। ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিতে সেই কথাই বলেছেন। আর ঋত্বিক ঘটকের স্মরণে নির্মিত 'শঙ্খচিল' ছবিতে পরিচালক গৌতম ঘোষ সেই কথাই তুলে ধরেছেন। দেশটাকে দু-টুকরো করার জন্য র‍্যাডক্লিফ যে লাইন টেনেছেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষেরা তাতে যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা যারা ভুক্তভোগী তারাই জানেন। এপার- ওপারের তেমনই সব মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনি 'শঙ্খচিল'। ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবি এ বছর শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটা শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছবি কেন হবে না— তা ভেবে পেলাম না। 'দখল', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'পার', 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং বছর তিনেক আগের 'মনের মানুষ' গৌতম ঘোষের প্রত্যেকটি ছবিই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তবু 'শঙ্খচিল' এ সবের ঊর্ধ্বে এক অসামান্য চলচ্চিত্র।

এ ছবির কাহিনি পরিচালক গৌতম ঘোষের। দেশভাগের স্মৃতি নিয়েই গৌতম ঘোষ ছবিটি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বৃটিশরাজ, মুসলিম লিগ আর কংগ্রেস মিলে ভাগ করে ফেলল দেশটাকে। অথচ বাঙালির মন, ভাষা, সংস্কৃতিতে কোনো সীমানা নেই। সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ক্ষমতার রাজনীতি দিয়ে দু-টুকরো করে ফেলা হল।' ছবির নায়ক এক জায়গায় বলছে, 'তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে খুকুর' পরে রাগ করো তোমরা যে সব বুড়োখোকা ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো তার বেলা?' 'শঙ্খচিল' এই সময়ের ছবি, কিন্তু বারে বারে স্মৃতিতে ফিরে না গেলে দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাসকে ভুলে থাকবে নতুন প্রজন্ম, তাদের তো দুঃসহ অতীতটাকে মনে করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ছবির নায়ক বাদল ধর্মাচারণে মুসলমান। দেশভাগের সময় তাঁর ঠাকুর্দা থাকতেন হুগলীর এক গ্রামে। দাঙ্গায় ভয় পেয়ে বাদলের বাবা চলে আসেন ইছামতীর এপারে সাতক্ষীরায়। ছবির পটভূমিকা এই ইছামতী নদীর পারে এক ছোট গ্রামে। স্কুলশিক্ষক বাদল (প্রসেনজিৎ) তাঁর স্ত্রী লায়লা (বাংলাদেশের শিল্পী কুসুম শিকদার) এবং ছোট্ট মেয়ে রূপসা (ঢাকার সাঁঝবাতি)। দর্শকদের অতীতকে মনে করিয়ে দেবার পাশাপাশি পরিচালক স্বপ্নও বুনেছেন। বাদল তার মেয়েকে শঙ্খচিল চেনায়, যে উড়ন্ত পাখি সীমান্ত মানে না। এদেশ থেকে ওদেশে উড়ে বেড়ায়। সীমান্ত মানে না।

শঙ্খচিল এ ছবির রূপক। জীবনানন্দের শঙ্খচিল। গৌতমের ছবিতে সুন্দরভাবে এসেছে, 'আবার আসিব ফিরে...' গানটি। আরও গান আছে— অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত, —মুকুন্দদাসের 'ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে। মাতঙ্গী মেতেছে আজ প্রলয়রঙ্গে'। এই দুটি গানই গেয়েছেন শিল্পী রূপঙ্কর। মনোময় গেয়েছেন একটি রজনীকান্তের গান। আরও একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত দাঙ্গার মধ্যেও পিতৃপুরুষের ভিটে না ছেড়ে যাওয়া বাদলের ঠাকুরর্দার মুখে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত— 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।' ঠাকুরর্দার চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন এবং গানটি যিনি গেয়েছেন সম্ভবত দুজনই বাংলাদেশের। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ওই দৃশ্য।

প্রসেনজিৎ ও মৌ রায়চৌধুরী ছাড়া বাংলাদেশের দু'জন এ ছবির প্রযোজক। গৌতমের সহ-কাহিনিকার সায়ন্তনী পুততুণ্ড। পরিচালকপুত্র ঈশান ঘোষের প্রথম সিনেমাটোগ্রাফি। সঙ্গীতের দায়িত্ব পরিচালক নিজে নিয়েছেন। বিরাট প্রান্তর, প্রবাহিত নদী, উন্মুক্ত আকাশ,—যা মেঘে বা সূর্যোদয়ে বারবার রং পালটায়। অপূর্ব সেই সব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেছেন পরিচালক। ছোট্ট মেয়ে রূপসার চরিত্রে সাঁঝবাতি এককথায় মনকাড়া অভিনয় করেছে। আর প্রসেনজিৎ এত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন— যা মনে দাগ কাটে। ছবিটি গত পয়লা বৈশাখ ভারত ও বাংলাদেশে এক যোগে মুক্তি পেয়েছে। মনুষ্যকৃত দেশভাগের মানবিক সমস্যার অসামান্য এক চলচ্চিত্রায়ণ গৌতম ঘোষের 'শঙ্খচিল'। ■

শব্দরূপ-৭৮৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

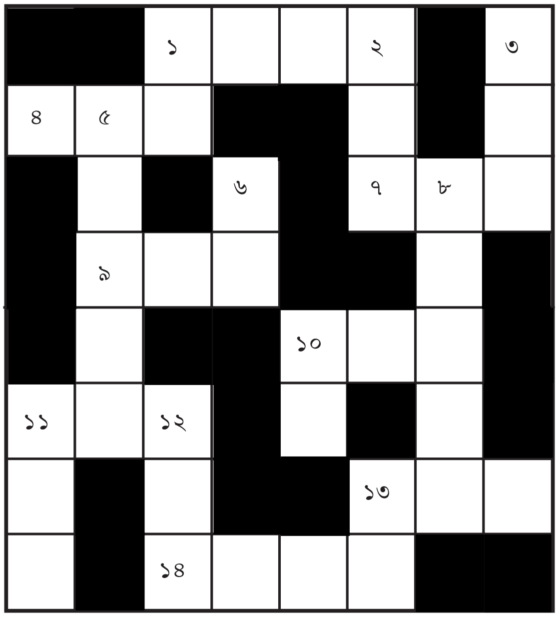

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** পিতা মাতা ইত্যাদির মৃত্যুজনিত বর্ষব্যাপী অশৌচ, **৪.** কর্মভারজনিত শ্রম; অতিব্যবহার, **৭.** চৈতন্যদেবের মাতৃদত্ত নাম, **৯.** মহাধনী; যক্ষরাজ, **১০.** 'দর্জিপাখি', **১১.** গুজরাটি নৃত্য-গীত, **১৩.** ব্যবহারজীবী; আইনব্যবসায়ী, **১৪.** অবন্ধুর, যাহা উঁচু-নীচু নয়।

উপর-নীচ : **১.** সময়; মৃত্যু, যম, **২.** পশুচারণের মজুরি বা বেতন, **৩.** আকাশগামী আতশবাজি, **৫.** কানের ফুটো, **৬.** শিব, **৮.** হাঁটুর হাড়, **১০.** বানররাজ, সুগ্রীবের অগ্রজ, **১১.** পৌরাণিক দেবযোনি বিশেষ; দেবগায়ক, **১২.** কাক, **১৩.** পশম।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮২
সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

		স	ং	স্কৃ	ত		গ
বা	স	ব			প		গুা
	চ্চি		গ		ন	ধ	র
	দা	ত	ব্য			র	
	ন			স	র	ণী	
ন	ন্দ	ন		ঙ্গ		ত	
হু		ন্দি			অ	ল	কা
ষ		নী	ল	ধ্ব	জ		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৮৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ মে ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

ভারতীয় ভাবনায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। বিকৃতি ও অব্যবস্থাগুলি দূর করারও উপায় আছে। কিন্তু মূল সত্য হলো--- ব্যক্তি ও সমাজ অভিন্ন ও অবিভাজ্য। সুসংস্কৃত অবস্থা হলো সেটাই যেখানে ব্যক্তি নিজের চিন্তা করতে গিয়ে সমাজের চিন্তা করে। দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, একে অপরের পরিপূরক। সমাজকে নষ্ট করে কেউ যদি নিজের ভাল চিন্তা করে— সেটা ভুল সিদ্ধান্ত। তাকে বিকৃতি বলে। এর দ্বারা ব্যক্তির মঙ্গল হবে না। কারণ এর ফলে সমাজ নষ্ট হলে ব্যক্তিকেও ফল ভোগ করতে হবে।

আমরা ব্যক্তিবাদী ও সমাজবাদী দুই-ই। ভারতীয় ভাবনা অনুসারে আমরা ব্যক্তির চেয়ে সমাজের চিন্তাই বেশি করি। সমাজের ভাল চিন্তা করা হয় তাই আমরা সমাজবাদী এবং ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয় তাই ব্যক্তিবাদী। ব্যক্তিকে সর্বেসর্বা মানা হয় না, তাই ব্যক্তিবাদী নই। আমরা সমাজ সম্পর্কে এরকম মনে করি না যে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য অপহরণ করে নেওয়া হোক, মনুষ্যকে শিকলে বেঁধে যন্ত্রের অংশ করে ফেলা হোক, তাই সমাজবাদী নই। আমাদের কল্পনা হলো—ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টি বা সমষ্টি ছাড়া ব্যষ্টি সম্ভব নয়, তাই আমরা দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় চাই।

ব্যক্তিবাদ হলো অধর্ম। রাষ্ট্রের জন্য কাজ করাই ধর্ম। রাষ্ট্রকার্য করার জন্য যা কিছু করা দরকার, করতে হবে। সত্যি, মিথ্যার যাচাই করলেই সমষ্টির কল্যাণ হবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

পরদিন রাজ্যসভায়....
একটা দুঃসংবাদ জানাচ্ছি। মহারাজ রামগুপ্ত মৃত।
কাপুরুষ গেছে, ঠিক হয়েছে!
গভীর রাতে রামগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।
লোকে ছুটে আসে রাজসভার দিকে......
চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক
গুপ্ত বংশের মুখোজ্জ্বল করতে চন্দ্রগুপ্তই পারেন।
হ্যাঁ। কুমার চন্দ্রগুপ্তই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী।
ক্রমশঃ

ভয়াবহ আগুনে মালদায় পাঁচটি গ্রাম ভস্মীভূত

পীড়িত পরিবারদের জন্য খাবার প্যাকেটের ব্যবস্থা করছেন স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৫ এপ্রিল ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল মালদা মোথাবাড়ি থানার চারটি গ্রাম। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় গৃহহীন হয়ে পড়েছে পাচকড়ি টোলা, মোতিটোলা, খাসমহল পাড়া ও গৌড়পাড়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আর এস এসের স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও বিজেপি কর্মীরা।

সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চেয়েছিলেন আম্বেদকর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কয়েক দশক কেটে যাওয়ার পরেও আম্বেদকর অবহেলিত থেকে গেছেন বলে কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের পরে একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের কলমে আম্বেদকর সম্পর্কে আরো একটি অজানা তথ্যের হদিশ দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ড. মুরলী মনোহর যোশী। তিনি লেখেন যে আম্বেদকর সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা করতে চেয়েছিলেন। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালীন সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্টে তিনি দেখেন যে সংবিধান সভায় অচলাবস্থা কাটানোর জন্য সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে সওয়াল করেছিলেন আম্বেদকর। ১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 'দ্য সানডে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডস্'-এ বিষয়ে লেখা আছে।

অবলুপ্ত সরস্বতীর হদিশ মরুর বুকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চর্চা কম হয়নি। অনেকের মতে রাজস্থান মরুভূমির বুকে হারিয়ে গেছে সরস্বতী। সাত বছর আগে রাজস্থানের জয়সলমীরের নাচানর চরণওয়ালা গ্রামের এক কৃষক জমিতে টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে ৫৬০ ফুট গভীরে জলের সন্ধান পায়। সেখান থেকে অনর্গল জল বেরতে থাকে। এই অভিজ্ঞতা শুধু তার একার নয়। ওই অঞ্চলের ৬০ বর্গকিলোমিটার জুড়েই মাটির তলায় জলের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যখন জলের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তখন পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরের এই মরু অঞ্চলে কৃষকের জমিতে জলের অভাব হচ্ছে না। কয়েক ফুট খোড়াখুড়ি করলেই মাটির তলা থেকে বেগে জল বেরিয়ে আসছে। এই অঞ্চলে অন্তত ১০টা টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। জয়সলমীরের পুনম নগরের গ্রামবাসী এই জলস্রোতকে অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী বলে মনে করে মন্দির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২০০৫ সালের অক্টোবরে ওএনজিসি বোর্ড ১.৭ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিল ঋকবেদে উল্লেখিত সরস্বতীর গতিপথ উদ্ঘাটন করার জন্য। ২০০৭ সালের মধ্যে ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন (ওএনজিসি) জয়সলমীরের বিভিন্ন অংশে কিছু কুয়ো খুঁড়ে ৫৫০ মিটার বা কোথাও আরও গভীরে জলের সন্ধান পায়। অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক সরস্বতীকে কেবলমাত্র পৌরাণিক নদী ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না। কিন্তু ইসরোর উপগ্রহ চিত্রে সরস্বতী নদীর গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠের তলায় অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী জল সঞ্চয়ের ফলে এই ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন প্রবীণ ভৌমজল বিশেষজ্ঞ নারায়ণ দাস ইনখিয়ার। জলবিজ্ঞানের মতে এই বিশেষ অবস্থাকে 'আর্টেজীয় কূপ বা অবস্থা' বলা হয়ে থাকে। ইনখিয়ারের মতে মাটির গভীরে এই জলের বিশাল ভাণ্ডার থাকতে পারে বটে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শুকিয়ে যাবে। সেন্ট্রাল অরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক প্রাক্তন গবেষক রাম সিং মারশিয়ারের মতে গবেষণার দ্বারাই স্পষ্ট হবে যে জয়সলমীরের মাটি ভেদ করে বেরোনো এই জলস্রোত আদৌ সরস্বতীর অংশ কিনা। তবে দেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ জয়সলমীরের এই জলস্রোতকে অবলুপ্ত সরস্বতী বলেই দাবি করেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
2 May - 2016 - Rs. 10.00